# অনির্বাণ জ্যোতি

শিশিরকুমার বসু

# অনির্বাণ জ্যোতি

# অনির্বাণ জ্যোতি

( নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী )

44

শিশিরকুমার বসু

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট ১৯৮৭/শ্রাবণ ১৩৯৪

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

বাংলা অনুবাদ :
শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

মূল্য : ২০ টাকা
( Rupees Twenty Only )



প্রকাশক : শ্রীসুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং,
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩
মুদ্রাকর : শ্রীঅশোককুমার ঘোষ, নিউশশী প্রেস,
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬

# নিবেদন

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের এই সংক্ষিপ্ত জীবনী কংগ্রেসের শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশের জন্য কংগ্রেসের শতবর্ষ উদযাপন কমিটি আমাকে লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁরা কিন্তু বইটি প্রকাশ করেননি এবং শেষ পর্যন্ত পাণ্ডুলিপিটি আমাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। সুভাষচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীতে দেশবাসীর আগ্রহ লক্ষ্য করে লিবার্টি পাবলিশার্স বইটি প্রকাশনের ব্যবস্থা করেন। ১৯৮৬ এর ১০ই অক্টোবর রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনে বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন।

ইংরাজিতে বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বইটি প্রকাশের জন্য অনুরোধ আসতে থাকে। প্রথমে বাংলায় অনুবাদের কাজ হাতে নেওয়া হয়। আজ এই কাজ সম্পূর্ণ হল।

তথ্যভিত্তিক, সত্যনিষ্ঠ ও সংক্ষিপ্ত নেতাজীর একটি জীবনীর যে বিশেষ প্রয়োজন আছে সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পঁচিশ বছর সুভাষচন্দ্রের এক অনন্য ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আদর্শগত, নীতিগত ও কৌশলগত দিক থেকে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে একমাত্র তিনিই মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের পাশাপাশি এক বিকল্প নেতৃত্ব দেশবাসীর সামনে রেখেছিলেন। যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেননি সেই নতুন প্রজন্মের জন্য এবং সত্যানুসন্ধানী সব মানুষের স্বার্থে সুভাষ-জীবনের পরিচিতি একান্তই প্রয়োজন। এই গ্রন্থে মাত্র দেড়শ পৃষ্ঠায় ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসের বোধ করি সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের জীবনব্যাপী সংগ্রাম ও সাধনার মূল কথাগুলি বলা হয়েছে। নানা ব্যক্তি সম্বন্ধে বা ঘটনাপ্রবাহের উপর নিজের মতামত বা মন্তব্য পাঠকের উপর চাপিয়ে দেবার কোন চেষ্টা আমি করিনি। আমার প্রথম প্রয়াস ছিল সত্যের প্রতি অবিচল থাকা এবং দ্বিতীয়ত ইতিহাসের ও সংগ্রামের ধারা ও গতি সম্বন্ধে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মতামত ও বিশ্লেষণ তাঁরই ভঙ্গিতে পাঠকের সামনে তুলে ধরা। যে কোন রাজনৈতিক পুরুষের জীবনী মূলত এই ধরনেরই হওয়া উচিত। তিরিশদশকের শেষ থেকে কংগ্রেস দলের ক্ষমতাসীন মহলের সুভাষচন্দ্রের প্রতি বিরূপ মনোভাবের কথা সকলেই জানেন—এমনকি বর্তমান নেতৃত্বও যেন উত্তরাধিকারসূত্রে এই বিরূপতা পেয়েছেন। সেজন্য অনেক স্পর্শকাতর, জটিল ও বিতর্কিত প্রশ্নে আমি নিরপেক্ষভাবে ও সাবধানতার সঙ্গে লিখেছি।

কোন এক বিশেষ ব্যক্তির আদর্শ ও রাজনীতি সকলেই যে অনুমোদন করবেন এমন কোন কথা নেই—অনুমোদন বা সমর্থন না করা কোন অপরাধ নয়। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে বা অপব্যবহার করে ইতিহাস বিকৃত করা, সত্য ইতিহাসকে ধামাচাপা দেওয়া, ইতিহাসকে পারিবারিক, ব্যক্তিগত, দলগত বা গোষ্ঠিগত সম্পত্তিতে পরিণত করা, প্রচারযন্ত্রগুলিকে মিথ্যা বা অর্ধসত্যের বাহক হিসাবে ব্যবহার করা, ঘৃণ্য অপরাধ। তথাকথিত কিছু মেকি বুদ্ধিজীবি ও চাটুকার ঐতিহাসিক যখন ঐ কাজে সহায়তা করেন তখন অপরাধ আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। সম্পত্তি ভাগ করা যায়,

সহজে ক্ষমতা দখলের লোভে দেশবাসীর ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিয়ে দেশ ভাগ করা যায়, রাজনৈতিক ক্ষমতাও চুক্তি করে ভাগ-বাটোয়ারা করা যায় কিন্তু ইতিহাস ভাগ করা যায় না। ইতিহাস একটা অখণ্ড সত্য এবং তার সার্বিক ও বিজ্ঞানসম্মত বিচারের ভিত্তিতেই আমাদের শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে। মুক্তি সংগ্রামের অনেক স্বপ্ন যে রূপায়িত হল না, এক মহাজাতি ও নতুন সমাজ গঠনের কাজে আমরা যে আজ পর্যন্ত ব্যর্থ তার প্রধান কারণই হল যে, আমরা ইতিহাসকে অস্বীকার করেছি, প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছি। দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের ও সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তিনি কোনদিন নীতির প্রশ্নে আপোষ করেননি—সেটা ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে হোক, জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে হোক বা সমাজবাদী আন্দোলনের প্রশ্নেই হোক। তাঁকে অস্বীকার করে লোকসান হয়েছে আমাদেরই, ভারতের নতুন রাষ্ট্র গঠনে ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় একটা বড় ফাঁক থেকে গেছে। আপোষহীন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায়, ভারতের একতা ও অখণ্ডতা রক্ষায় এবং সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের জনগণের সংগ্রামের এক উজ্জ্বল নিষ্কলুষ প্রতীক হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসুর সমকক্ষ দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে আর কেউ নেই। আরও অনেক নেতৃত্ব আমরা দেখেছি ও দেখছি—দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী ও বামপন্থী—সকলেই পদে পদে বারবার আদর্শ ও নীতির প্রশ্নে আপোষ করেছেন এবং গণসংগ্রামের পথ থেকে সরে গিয়ে নিছক সুবিধাবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। এই সবেরই ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা আজ দেখছি ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্নতাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, ভ্রষ্টাচার ও জঘন্য প্রতিক্রিয়াশীল ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির আধিপত্য। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে হলে আমাদের জাতীয় জীবনে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের আদর্শ ও নীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ আর এক কঠিন সংগ্রাম। এই দুরূহ কাজে আলো দেখাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অবিনশ্বর জীবনের বাণী ও কীর্তি।

ইংরাজি থেকে অনুবাদের কাজ বন্ধুবর শ্রী শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন এবং মূল রচনার ভাব ও ভঙ্গি বজায় রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এই বই প্রকাশে দে'জ পাবলিশিং এর কর্তৃপক্ষের উৎসাহ ও আগ্রহ উল্লেখযোগ্য। এঁদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আশাকরি এই সংক্ষিপ্ত জীবনী বাঙ্গালী পাঠকসমাজকে বিশেষ করে বর্তমান যুবসমাজকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে নতুন করে মনে করিয়ে দিতে সাহায্য করবে। জয় হিন্দ্—

শিশিরকুমার বসু

বসুন্ধরা
৯০ শরৎ বসু রোড
কলিকাতা-২৬
৭ই জুন ১৯৮৭

অনির্বাণ জ্যোতি
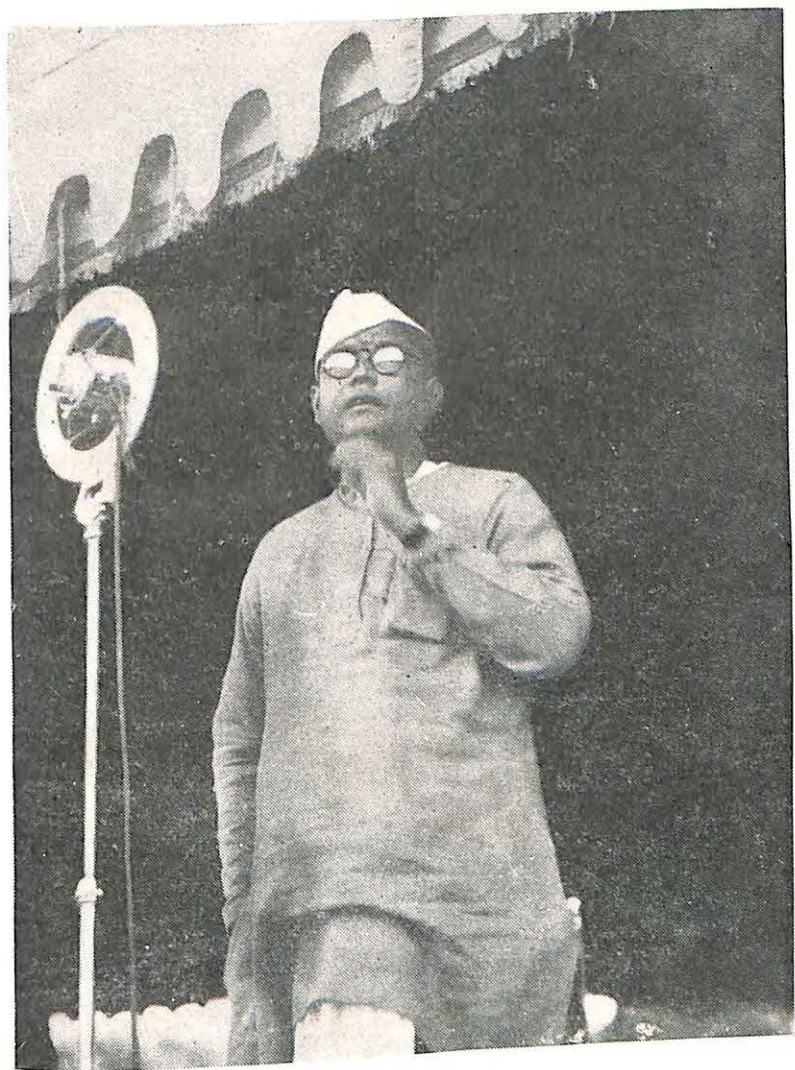
বিহারে সফরের সময় ১৯৩৯

ইম্‌ফল্‌ যুদ্ধের প্রাক্কালে আজাদী সৈনিকদের সঙ্গে ১৯৪৪

১৭৫৭ সালে বাঙ্গলায় ইংরেজদের হাতে প্রথম পরাজয়ের পর ভারতবর্ষের জনগণ একশ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে কঠিন ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহর নেতৃত্বে ১৮৫৭ সালে স্বাধীন জাতি হিসাবে তারা শেষ যুদ্ধ করেছিল। তাদের সব বীরত্ব এবং আত্মত্যাগ কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল; দুর্ভাগ্য এবং নেতৃত্বের ভুলে শেষ পর্যন্ত তাদের পতন ও পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। স্বাধীনতার এই প্রথম যুদ্ধে আমাদের পরাজয়ের পর ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশরাজ প্রত্যক্ষভাবে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তখন সারা ভারতে সুপরিকল্পিতভাবে দমননীতি প্রয়োগ করতে সুরু করল এবং ভারতবর্ষের সমসাময়িক ইতিহাসে একটি নতুন যুগের সূচনা হল। ১৮৫৭ সালের পরের সঙ্কটময় নব্বই বছরের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মের বছর ১৮৯৭ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ তাঁর জন্মের ৪০ বছর আগের ঘটনা এবং ঠিক পঁয়তাল্লিশ বছর পরে সুভাষচন্দ্র নিজে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার চূড়ান্ত সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব দিলেন। ১৮৯৭ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যখন রাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছিল, সেই বছরেই ঐ সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তিকে যিনি পঁয়তাল্লিশ বছর পরে চ্যালেঞ্জ জানাবেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী সেই অসমসাহসী প্রবাদপুরুষ উড়িষ্যার একটি ছোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বাস্তবিকপক্ষে সুভাষচন্দ্রের জন্ম ভারতের জনগণের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন অভিযানের ঠিক মধ্যবর্তী সময়টি চিহ্নিত করেছিল।

সুভাষচন্দ্রের বাবা জানকীনাথ বসু বাঙ্গলার চব্বিশ পরগণা জেলার একটি ছোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু আইন ব্যবসা করার

জন্য তিনি কটকে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। সেই সময় কটক ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর এক কোণের ছোট একটি শহর এবং কলিকাতার সঙ্গে কটকের রেল যোগাযোগও ছিল না। পরে অবশ্য কটক উড়িষ্যার রাজধানী হয়েছিল। জানকীনাথের পক্ষে জীবিকার সন্ধানে কটকের মত জায়গায় যাওয়াটাই ছিল সত্যিই একটি দুঃসাহসিক কাজ। ভাগ্য সাহসীদেরই সহায় হয়। সুভাষচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন তার মধ্যেই জানকীনাথ তাঁর নতুন বাসভূমিতে আইন ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গিয়েছেন। তিনি সরকারী উকিল এবং কটক মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯১২ সালে তিনি বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হন। সরকারী উকিল থাকাকালীন সময়েও তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতে যোগদান করতেন; সেজন্য তাঁকে মাঝে মাঝে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হতে হত। ১৯৩০ সালে যখন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন চলছিল এবং ব্রিটিশ সরকার দেশে ব্যাপক দমন-নীতি ও ভয়াবহ আতঙ্ক সৃষ্টি করছিল, জানকীনাথ তার প্রতিবাদে 'রায় বাহাদুর' উপাধি ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন সত্যিকারের পরোপকারী, ধর্মপ্রাণ এবং খাদি, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পৃষ্ঠপোষক। যখন তাঁর দুই পুত্র শরৎ এবং সুভাষ কংগ্রেসের ও দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তিনি তাঁদের সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের মাতা প্রভাবতী ছিলেন উত্তর কলিকাতার হাটখোলার ঐতিহ্যপূর্ণ দত্ত পরিবারের কন্যা। তাঁর আট পুত্র এবং ছয় কন্যা; সুভাষচন্দ্র হলেন তাঁদের মধ্যে নবম। তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা এবং বিশেষ বাস্তববোধ ও সাধারণ বুদ্ধির অধিকারী। পারিবারিক সব ক্ষেত্রে ছিল তাঁর সম্পূর্ণ আধিপত্য এবং তিনি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে বিরাট একটি সংসার পরিচালনা করতেন। তিনি এবং তাঁর স্বামী দুজনেই, তাঁদের দুই সন্তান শরৎ এবং সুভাষকে দেশের স্বাধীনতার জন্য যে দুঃখবরণ ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল, তা ধৈর্যের সঙ্গে শান্তভাবে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২১ সালে ডিসেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্রের

প্রথম গ্রেপ্তারের খবর তাঁর বাবা-মা যখন পান, জানকীনাথ অগ্রজ শরৎচন্দ্রকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : 'আমরা সুভাষের জন্য এবং তোমাদের সকলের জন্য গর্বিত।' মা আরও মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি এরকম ঘটনা যে ঘটবে তা জানতেন ; কারণ তিনি 'মহাত্মা গান্ধীর আত্মত্যাগের মতবাদে' বিশ্বাসী ছিলেন এবং মনে করতেন যে সেই পথেই দেশের স্বাধীনতা আসবে।

এই পরিবারের ইতিহাসের প্রায় সাতাশটি বংশানুক্রমিক ধারা জানা যায়। জনৈক দশরথ বসু এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর বংশধরেরা কলিকাতার প্রায় চোদ্দ মাইল দক্ষিণে মাহীনগর গ্রামে বসবাস করতে এসেছিলেন। সেজন্য এঁরা 'মাহীনগরের বসু পরিবার' বলে পরিচিত। দশরথ থেকে এই বংশের একাদশ ধারায় ছিলেন মহীপতি বসু। তিনি এক অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন এবং সেই সময়কার বাঙ্গলার নবাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ; নবাব তাঁকে অর্থ এবং যুদ্ধ মন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন। মহীপতি 'সুবুদ্ধি খান' উপাধি লাভ করেছিলেন এবং রাজকীয় স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে জমির জায়গীর উপহার দেওয়া হয়েছিল। ঐ গ্রামটি এখনও 'সুবুদ্ধিপুর' নামেই পরিচিত। মহীপতির প্রপৌত্রের পুত্র গোপীনাথ বসু ছিলেন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এক ব্যক্তি এবং শক্তিধর পুরুষ। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সুলতান হুসেন শাহের অধীনে অর্থমন্ত্রী এবং নৌবাহিনীর সেনাপতি হয়েছিলেন। তাঁর সম্মানসূচক উপাধি ছিল 'পুরন্দর খান' এবং মাহীনগরের অদূরে তাঁর জায়গীর আজও 'পুরন্দরপুর' নামে পরিচিত। পুরন্দর এবং তাঁর পূর্বসূরীরা বংশানুক্রমে মন্ত্রী হিসাবে কাজ করার জন্য পরিবার হিসাবে তাঁদের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ও খ্যাতি ছিল। পুরন্দর যেহেতু মাহীনগরের বাসিন্দা ছিলেন, সেজন্য জায়গাটি দক্ষিণ বাঙ্গলার কায়স্থদের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল। পুরন্দর একজন বিরাট সমাজ সংস্কারক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কায়স্থদের মধ্যে প্রচলিত সেকেলে সামাজিক রীতিনীতির পর্যালোচনা করে সেগুলির সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং সমগ্র

গোষ্ঠীর সামাজিক সংহতির জন্য তিনি শত সহস্রাধিক লোকের একটি সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। এই বিরাট সমাবেশের জন্য বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে একটি বড় পুকুর কাটাতে তিনি অসংখ্য কর্মী নিযুক্ত করেছিলেন। মাহীনগর সংলগ্ন একটি স্থানে সারাদিনের কাজের পর কর্মীরা তাঁদের কোদালগুলি জমা করে রাখতেন। এই জায়গাতেই কোদালিয়া গ্রামটি গড়ে উঠেছিল এবং এই গ্রামেই জানকীনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই গ্রামটিই হয়েছিল তাঁর পরিবারের বাসস্থান। জানকীনাথ এবং সুভাষচন্দ্র সহ তাঁর সন্তানরা কোদালিয়া গ্রামের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। জানকীনাথ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ওই গ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন এবং এর সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করেছিলেন। গ্রামবাসীদের সঙ্গে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হওয়ার জন্য তিনি প্রতি বছর দুর্গাপূজাকে একটি বিশেষ উপলক্ষ করতেন এবং এই অনুষ্ঠানে তাঁর ছেলেমেয়েরাও অংশ গ্রহণ করত। সুভাষচন্দ্রের বয়স যখন মাত্র পনের বছর তখনই তিনি মা প্রভাবতীকে দেশের গ্রামে তাঁর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে মর্মস্পর্শী চিঠি লিখতেন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে শরৎচন্দ্র কোদালিয়া গ্রাম পুনর্গঠনের কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। বসুরা ছাড়াও ছোটগ্রাম কোদালিয়ায় অনেক দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবীর জন্ম হয়েছিল, যাঁরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। এম, এন, রায় তাঁদের অন্যতম।

২

সুভাষচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—'একেবারে শৈশবের যে কথা আমার মনে পড়ে তা হল এই যে নিজেকে নিতান্তই এক তুচ্ছ জীব বলে মনে হত।' ছোটবেলায় তিনি পিতামাতার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিশেষভাবে চাইতেন; কিন্তু তা থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন। কারণ তাঁদের পরিবারটি ছিল বিরাট এবং তাঁর

পিতামাতা ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। যিনি গোড়ায় নিজেকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ বলে মনে করতেন তাঁর ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের তাৎপর্যপূর্ণ ধারাগুলি জানা বেশ আকর্ষণীয় হবে।

পরিবারের অন্যান্যদের মত সুভাষচন্দ্রকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কটকের প্রটেষ্ট্যান্ট ইয়োরোপীয়ান স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল। স্কুলটি ছিল বিলাতী কায়দায় এবং ধারায় পরিচালিত। এজন্য দেশী স্কুলগুলিতে পাঠরত সঙ্গীদের তুলনায় সুভাষচন্দ্র এবং অন্য যারা ঐ স্কুলে পড়ত তারা ইংরাজীর জ্ঞানে এবং ইংরাজী-ঘেঁষা শিক্ষায় এগিয়ে ছিল। এই ধরনের স্কুলে পড়ায় অতিরিক্ত যা লাভ হল তা হল নিয়মানুবর্তিতা, সঠিক আচার-ব্যবহার, কাজে পরিচ্ছন্নতা এবং সময়ানুবর্তিতা। সুভাষচন্দ্র যদিও এই স্কুলে অসুখী ছিলেন না, মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে আরম্ভ করেছিলেন যে তাঁরা দুটি আলাদা জগতে বাস করছেন এবং এই দুই-এর মধ্যে বনিবনা সবসময় সম্ভব নয়। লেখাপড়ায় তিনি সর্বদাই সবচেয়ে ওপরে থাকতেন; কিন্তু খেলাধূলায় তিনি ভাল ছিলেন না। ১৯০৯ সালে যখন ইয়োরোপীয়ান মিশনারী স্কুল ছাড়ার সময় এল, তখন তাঁর কোন দুঃখ হয়নি।

তারপর যখন তিনি র‍্যাভেন্‌স কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হলেন, তখন তাঁর সম্পূর্ণ মানসিক ও মনস্তাত্বিক পরিবর্তন হল। এই স্কুলে যে ভারতীয় পরিবেশ ছিল তাতে তাঁর নিজের সম্বন্ধে ধারণা উচ্চতর হল এবং তিনি নতুন করে আত্মবিশ্বাস পেলেন। প্রাথমিক স্তরে তাঁকে মাতৃভাষা বাংলা শেখান হয়নি; তাই গোড়ার দিকে বাংলা ছাড়া তিনি পড়াশুনায় ভালই করবেন আশা করা গিয়েছিল; কিন্তু তিনি কঠিন পরিশ্রম করে এই অসম্পূর্ণতা পূরণ করে নিয়েছিলেন এবং অবশেষে তিনি প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় বাংলায় সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে সংস্কৃতও শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁর কার্যকলাপের মধ্যে খেলাধূলা অবহেলিত ছিল এবং সেজন্য তিনি বাকি জীবন আক্ষেপ করেছেন।

র‍্যাভেন্‌স কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ওড়িয়া এবং বাঙ্গালী দুই সম্প্রদায়ের লোকই ছিল এবং তাদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ। বসুগৃহে কয়েকজন ওড়িয়া, হিন্দু ও মুসলমান বাড়ীর কাজকর্ম করত এবং সেখানেও সেই একই সহৃদয়তার পরিবেশ ছিল। সুভাষচন্দ্রের পিতামাতার মন ছিল উদার এবং গভীর সহানুভূতিশীল এবং তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সমগ্র পরিবারের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এজন্য সুভাষ এবং তাঁর সমসাময়িকরা সংকীর্ণ ও প্রাদেশিকতার মনোভাব নিয়ে কখনও চিন্তাও করতে পারতেন না।

শিক্ষকদের মধ্যে যিনি সুভাষের তরুণ মনে স্থায়ী ছাপ রেখেছিলেন, তিনি হলেন র‍্যাভেন্‌স কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস। তিনি তাঁর ছাত্রের বিকাশশীল মনে 'রুচিজ্ঞান ও নৈতিক মূল্যবোধ' জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ছাত্রকে বলেছিলেন যে মানবজীবনে অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় নৈতিক মূল্যবোধ। তিনি তাঁকে বলেছিলেন প্রকৃতির কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে যাতে প্রকৃতি তাঁর সঙ্গে কথা বলে। সুভাষ পাহাড়ের ওপর বা নদীর তীরে সুন্দর জায়গা অথবা মনোমুগ্ধকর সূর্যাস্তের আভায় উজ্জ্বল তৃণবহুল ক্ষেত্র খুঁজে বার করে সেখানে ধ্যান অভ্যাস করতেন। বেণীমাধবের শিক্ষায় তিনি মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা জেনেছিলেন এবং তা তার মন সংহত করতে সাহায্য করেছিল।

সুভাষচন্দ্রের বয়স যখন পনের বছরের মত সেই সময় তিনি মানসিক ও আত্মিক জীবনের অন্যতম ঝঞ্ঝাসঙ্কুল কালে প্রবেশ করেন এবং তাঁর অন্তরে এক প্রবল মানসিক দ্বন্দ্ব এবং কষ্টভোগের সূত্রপাত হয়। এই দ্বন্দ্বটি ছিল জাগতিক ও পার্থিব জীবন এবং সাধারণ শারীরিক কামনা-বাসনার সঙ্গে তাঁর উন্নততর সত্তার সংঘাত।

প্রকৃতি-পূজা তাঁকে সাহায্য করলেও এই দ্বন্দ্বের সমাধানের পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না। এই সময়ে যখন তাঁর বয়স সবেমাত্র পনের, তাঁর জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবেশ করলেন। আকস্মিকভাবেই

স্বামীজীর রচনাবলীর প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তিনি সেগুলি মন দিয়ে পড়তে আরম্ভ করেন এবং ফলে তাঁর মানসিক দিক দিয়ে আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। তিনি যা খুঁজছিলেন তা তিনি পেলেন—একটি মূল নীতিবোধ যার ওপর তিনি সারাজীবন নির্ভর করতে পারেন। বিবেকানন্দ চর্চা করে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে নিজের মুক্তির জন্য কাজ করা এবং মানব সেবায় নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করাই হবে জীবনের লক্ষ্য। ভগিনী নিবেদিতার মত তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষের সেবা বলতে নিজের দেশের সেবাও বোঝায়; কারণ স্বামী বিবেকানন্দর কাছে 'জন্মভূমিই ছিল তাঁর পূজার প্রতিমা।' প্রতিটি ভারতবাসীই তাঁর ভাই এবং লোকশক্তি উত্থানের ওপরই ভারতবর্ষের মুক্তি নির্ভর করছে—স্বামীজীর এই অনুশাসন তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কেবল বিশ্বাস এবং শক্তিই মুক্তি দিতে পারে, প্রাচীন শাস্ত্রের স্বামীজীর এই ব্যাখ্যাও সুভাষচন্দ্র মেনে নিয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের মন বিবেকানন্দ থেকে তাঁর গুরু রামকৃষ্ণের দিকে আকৃষ্ট হল; রামকৃষ্ণর শিক্ষার সারকথা ছিল, কেবলমাত্র ত্যাগের মাধ্যমেই উপলব্ধি বা মুক্তি সম্ভব। সুভাষচন্দ্র একটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবগোষ্ঠী সংগঠিত করেছিলেন। পরিবারের মধ্যে এবং বাইরে এই গোষ্ঠী উদ্বেগ ও বিরোধ সৃষ্টি করেছিল; কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে নি। পারিবারিক বাধা উপেক্ষা করে সুভাষচন্দ্র এগিয়ে গেলেন। তিনি যখন পরিবারের এবং সমাজের বিপরীত শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করছিলেন, তাঁর নিম্ন সত্তার আভ্যন্তরীণ শক্তির সঙ্গেও ভীষণ দ্বন্দ্ব চলছিল। এই সঙ্কটময় সময়ে সুভাষচন্দ্র বাড়ীর থেকে দূরে থাকলেই ভাল বোধ করতেন। আসলে প্রয়োজন হল মানসিক ও আধ্যাত্মিক চর্চা—এই ভেবে তিনি যোগ অভ্যাস সম্বন্ধে সব ধরনের বই আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন এবং তিনি এই ধরনের অভ্যাসগুলি লুকিয়ে পরীক্ষা করতেন। যে কোন সন্ন্যাসীর আবির্ভাবের খবর পেলেই সুভাষ এবং তাঁর দল তাঁর কাছে দৌড়ে যেতেন। কয়েক মাস

ধরে এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিরর্থকতা উপলব্ধি করে তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নৈতিক শিক্ষায় ফিরে যান। ষোল বছর বয়সের আগেই গ্রামীণ পুনর্গঠনের কাজে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল এবং তাঁর এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে ধর্মীয় জীবন বলতে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত যোগ বোঝায় না, পরন্তু জন্মভূমির সেবা সহ মানুষের সেবা বোঝায়। ছোটবেলায় যখন অযৌক্তিক ধর্মবিশ্বাস মনকে প্রভাবিত করে, সেই সময় বিবেকানন্দ তার মনকে মুক্ত করার কাজে বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন ; কারণ স্বামীজীর আদর্শ বিজ্ঞান এবং ধর্মের সমন্বয়ে যুক্তিবাদী দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

স্কুল জীবনের শেষে কলিকাতার একটি দলের বার্তাবহ এক দূত তাঁর সঙ্গে কটকে দেখা করেন এবং এইভাবে সুভাষ প্রথম রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা পান। জনৈক ডাক্তারী ছাত্রের নেতৃত্বে এই দলটির দ্বিবিধ লক্ষ্য ছিল—আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং জাতির সেবা—সুভাষচন্দ্রের মন তখন যে মতবাদের দিকে যাচ্ছিল, এই লক্ষ্য দুটি তার সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এই যোগাযোগ বেশ কয়েক বছর বজায় ছিল।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সময় যত কাছে এগিয়ে আসতে লাগল, তাঁর পিতা-মাতা ততই চিন্তিত হয়ে পড়লেন, কারণ সম্ভাবনাপূর্ণ ও উজ্জ্বল একটি ছেলে একগুঁয়ে, খামখেয়ালী এবং অনমনীয় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যখন পরীক্ষার ফল বেরোল, দেখা গেল যে সুভাষ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন। কলিকাতার বাস্তব পরিবেশে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনে সুভাষের ভালই হবে এই ভেবে খুশি হয়েই তাঁর পরিবার তাঁকে উচ্চশিক্ষার জন্য কলিকাতায় পাঠিয়ে দিলেন।

৩

কলিকাতায় সুভাষের ভাগ্যে যে কি ছিল, তাঁর পরিবারের লোকেরা তা মোটেই অনুমান করতে পারেননি। মফঃস্বল শহর থেকে

কলিকাতায় আসা একটি তরুণ ছাত্রের জীবনযাত্রায় যে পরিবর্তন হয়, তার ফলাফল যে ভালই হবে এমন নয়। বাস্তবিকপক্ষে এ ধরনের পরিবর্তন সম্ভাবনাপূর্ণ অনেক যুবকেরই পতনের কারণ হয়েছে। যাই হোক সুভাষ কতকগুলি আদর্শ ও মূল নীতির প্রতি পুরোপুরি বিশ্বাস নিয়েই কলিকাতায় এসেছিলেন। তিনি ঠিক করেছিলেন যে গতানুগতিক পথে না চলে তাঁর নিজের আধ্যাত্মিক অগ্রগতি এবং দেশবাসীর মঙ্গল সাধনের লক্ষ্য সামনে রেখে জীবনের গতি ঠিক করবেন। ইতিমধ্যেই তিনি জীবনকে গভীরভাবে গ্রহণ করতে শিখেছিলেন এবং কলেজ জীবনের প্রারম্ভে তাঁর এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে জীবনের একটি অর্থ এবং একটি উদ্দেশ্য আছে।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা কলেজ—প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কলেজ খোলার আগেই তিনি সময় নষ্ট না করে, যে দলের কর্মী কটকে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিল, সেই আদর্শবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কলেজে কিছু মেকী-অভিজাত, এবং কিছু কেতাব-সর্বস্ব ভাল ছেলের দল ছাড়া অন্য একটি দল ছিল। সুভাষচন্দ্র এই দলে ছিলেন এবং তাঁরা নিজেদের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী বলে মনে করতেন। আর বাকী দলটি ছিল বিপ্লবীদের একটি গুপ্ত গোষ্ঠী।

১৯১৩ সালে সুভাষ যখন কটক ছেড়ে আসেন, তখন তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা এবং সমাজসেবা সম্বন্ধে যে ধ্যানধারণা ছিল, তা ছিল অস্পষ্ট। কলিকাতায় এসে তিনি শিখলেন যে সমাজ সেবা হল যোগ-এর অখণ্ড অংশ এবং আধুনিক ধারায় জাতির পুনর্গঠনও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যে দলটিতে তিনি ছিলেন সে দলটি কেবল নতুন সভ্য সংগ্রহ করতেই যে উৎসাহী ছিলেন তা নয়, তাঁরা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং জ্ঞান ও অনুপ্রেরণা লাভের জন্য ভারতবর্ষের ধর্মস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানগুলিতে ভ্রমণও করতেন। সেই সময়ে অরবিন্দ ঘোষ তাঁদের খুব প্রভাবিত করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে অরবিন্দ যে বামপন্থী চিন্তাধারা তুলে ধরেছিলেন

এবং পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী রেখেছিলেন, তা সুভাষ এবং তাঁর গোষ্ঠীর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। কারণ তখন অধিকাংশ নেতাই কেবল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন পেলেই সন্তুষ্ট হতেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকও যথেষ্ট শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সেই সময় গুজব রটেছিল যে অরবিন্দ ঘোষ ধ্যান করার জন্য পণ্ডিচেরীতে চলে গেছেন এবং বার বছর পরে সিদ্ধিলাভ করে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য ফিরে আসবেন। অরবিন্দ সম্বন্ধে যে অতীন্দ্রিয়বাদের কথা বলা হত, তা সুভাষকে আকৃষ্ট করেনি, তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল অরবিন্দের রচনাবলী, তাঁর দর্শন এবং যোগের সমন্বয় সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারা।

যতদিন রাজনীতি সুভাষকে টানেনি, তিনি ধর্মীয় শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করতেন এবং নানারকম সমাজসেবার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। কলেজে অধিকাংশ ক্লাশের বক্তৃতা তাঁর ভাল না লাগায় পড়াশুনায় তিনি অবহেলা করতে শুরু করেন। বিতর্ক সভার আয়োজন, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ ত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং নানাস্থানে ভ্রমণ ইত্যাদিতে তিনি বেশী আগ্রহী ছিলেন এবং এই ধরনের কাজকর্ম তাঁর মনের অন্তর্মুখী প্রবণতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। একদিকে প্রাচুর্য এবং অন্যদিকে কঠিন দুঃখ—প্রচলিত এই সামাজিক নীতির মধ্যে যে অন্যায় ও অবিচার ছিল সে সম্বন্ধে তিনি ক্রমেই বেশী সচেতন হয়ে উঠছিলেন। এই সচেতনতা তাঁকে ক্রমশঃ ঐ নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলল এবং সামাজিক সম্পর্কের মূলতত্ত্ব তাঁকে বেশ ভাবিয়ে তুলল। কটকে একবার ছুটির সময় যখন তিনি একদল উৎসাহী ছেলের সঙ্গে সব বাধানিষেধ উপেক্ষা করে কলেরা মহামারীর সময়ে সেবা-শুশ্রূষার কাজে নেমে পড়েছিলেন, তখন তিনি ভারতের গ্রামাঞ্চলের কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছিলেন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন—'এক সপ্তাহের অভিজ্ঞতা আমার চোখের সামনে এক নতুন জগত খুলে দিল এবং আসল গ্রামীণ ভারতবর্ষের একটি ছবি তুলে ধরল, যে ভারতবর্ষে দারিদ্র্য সারাদেশকে গ্রাস করে বসে আছে,

মানুষ মশামাছির মত মরে এবং নিরক্ষরতা সর্বব্যাপী।'

কটকে তাঁর স্কুল জীবনের শেষদিকের মত কলিকাতাতেও কলেজ জীবনের গোড়ার দিকে সুভাষ সাধু-সন্ধান করে বেড়াতেন। এর উদ্দেশ্য ছিল জীবনে একজন গুরু বা আচার্য খুঁজে পাওয়া। তিনি কঠোর তপস্যাপরায়ণ সাধুদের সন্ধান করে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতেন; তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সরল জীবনযাত্রা অথচ উন্নত চিন্তার জন্য তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। অবশেষে, ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে কাউকে কিছু না বলে তিনি এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে চুপচাপ বাড়ী ছেড়ে চলে যান। তাঁরা উত্তর ভারতের নানা তীর্থস্থান, ঐতিহাসিক স্থান এবং বিশিষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি ঘুরে ঘুরে দেখেন। অনেক আশ্রমেও তাঁরা যান এবং অনেক সাধুর সঙ্গে দেখা করেন। এগুলির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিন্দুধর্মের মূল নীতির চেয়ে কুসংস্কার ও অর্থহীন ধর্মানুষ্ঠান প্রচলিত দেখে তাঁর বিভ্রান্তি দূর হয়েছিল। এইরকম ধর্মস্থানের ধর্মগুরুরা যে জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার নীতি চালাতেন, তা দেখে তরুণ সুভাষ মনে আঘাত পেয়েছিলেন। বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণের সময় বেনারসে রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়; তিনি ওঁদের পরিবারকে ভালভাবেই জানতেন। এই ধরনের কিছু ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনার পর এবং তথাকথিত ধর্মগুরু এবং ধর্মস্থানগুলি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে তাঁর মানসিক ভারসাম্য ফিরে এসেছিল। তাঁর পিতামাতা এবং পরিবারের অন্যান্যরা তাঁর পলায়নের কয়েক সপ্তাহ গভীর উদ্বেগের মধ্যে কাটিয়েছিলেন। অবশেষে, যেমন নিঃশব্দে তিনি চলে গিয়েছিলেন, তেমনি নিঃশব্দেই একদিন সকালে তিনি বাড়ীতে ফিরে এলেন। এর কয়েকদিন পরে তিনি টাইফয়েডে শয্যাশায়ী হন। তাঁর এই অসুস্থতার সময়েই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

কলিকাতার ছাত্রসমাজে বিপ্লবীদের প্রচার সত্ত্বেও তখনও পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের জীবনে রাজনীতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেনি। তিনি তখনও অ-রাজনৈতিক ধারায় আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবন এবং জাতীয়

পুনর্গঠনে বিশ্বাস করতেন। কারণ কটকের মত সুদূর সহরে কলিকাতার মত ইংরাজদের উপস্থিতি তত প্রত্যক্ষ ছিল না। কলিকাতায় ইংরাজ শাসকরা যে কেবল্ প্রবল প্রতাপ দেখাত, তাই নয়, তারা প্রতি পদে পদে এবং প্রতি স্তরে ভারতবাসীদের অপমান করত। তারা পথে ঘাটে, ট্রেনে, রাস্তার যানবাহনে জাতিগত ঔদ্ধত্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করত। এমনকি তারা সমাজের সম্ভ্রান্ত ও মান্যগণ্য ব্যক্তিদেরও রেহাই দিত না। জাতিগত সংঘাতে ভারতীয়দের পক্ষে আইন কোন উপকারে লাগত না। সেজন্য সকলের একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে ইংরাজরা গায়ের জোর ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। এই ধরনের অভিজ্ঞতা সুভাষের রাজনৈতিক সচেতনতা এনে দিয়েছিল যদিও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার একটা নতুন দিক খুলে দিতে পারেনি। তারজন্য বিশ্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল। পত্র-পত্রিকায় যখনই তিনি পৃথিবীর নানা ঘটনার বিষয় পড়াশুনা করতেন, তখনই তিনি যেসব মূল্যবোধ আগে মেনে নিয়েছিলেন, সেগুলি আবার পুনর্বিবেচনা করে দেখতেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে একটি জাতির জীবনকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাগ করা যায় না। আমরা তার একটি অংশ নিজেদের জন্য রেখে অন্য অংশটি বিদেশীদের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না। ভারতবর্ষকে যদি একটি আধুনিক সভ্য জাতি হতে হয়, তাহলে ভারতবাসীদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অবশ্যই কাজ করতে এবং সংগ্রাম করে যেতে হবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিভাগযোগ্য নয়, আর তার চেয়েও বড় কথা একটি স্বাধীন জাতির স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য সামরিক শক্তি থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কলেজে পরবর্তী দু'বছর সুভাষের দার্শনিক এবং রাজনৈতিক চিন্তায় দ্রুত উন্নতি হয়েছিল এবং ভেতরে ভেতরেও তাঁর অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। তিনি তাঁর সঙ্গীসাথীদের সঙ্গেই বেশী সময় কাটাতেন; সংখ্যার দিক থেকেই তাঁরা যে কেবল বাড়ছিল তা নয়, গুণগত দিক থেকেও উন্নত হচ্ছিল। ফলে ১৯১৫ সালে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় তিনি ভাল ফল করতে পারেননি। ডিগ্রী

কোর্সে তিনি দর্শনে অনার্স নিয়েছিলেন—এটি তাঁর অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল। এর পর তিনি পড়াশুনায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে পড়াশুনা করে তিনি পেয়েছিলেন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন নিয়মানুবর্তিতা ও যুক্তিবাদী মানসিক গঠন। তিনি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিলেন যে সত্যিকার স্বাধীন একজন মানুষ প্রমাণ ও যুক্তি ছাড়া কিছু মেনে নিতে পারে না।

১৯১৬ সালের গোড়ার দিকের দুটি ঘটনা সুভাষচন্দ্রের জীবনে এবং জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন এনে দিল। জানুয়ারী মাসে একদিন সকালে এক ইংরাজ অধ্যাপক ই. এফ. ওটেন তাঁর ক্লাস ঘরের সামনের বারান্দায় কিছু ছাত্র গণ্ডগোল করায় বিরক্ত হয়ে কয়েকজন ছাত্রকে টানাহেঁচড়া ও ধাক্কাধাক্কি করেছিলেন। ছাত্ররা দাবী করেছিল তিনি এই ঘটনার জন্য ক্ষমা চান, কিন্তু তিনি তা করতে রাজী না হওয়ায় কলেজে সাধারণ ধর্মঘট হল। তখনকার দিনে প্রেসিডেন্সী কলেজে ধর্মঘট চিন্তার অতীত ছিল। ধর্মঘটের অন্যতম নেতা সুভাষকে সতর্ক করে দেওয়া হল; কিন্তু তিনি দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে অবশেষে অধ্যাপকের সুবুদ্ধির উদয় হল এবং তিনি আপসে ছাত্রদের সঙ্গে ব্যাপারটি মীমাংসা করে নিয়েছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, অধ্যক্ষ জরিমানার আকারে ছাত্রদের ওপর যে শাস্তিব্যবস্থা ধার্য করেছিলেন তা প্রত্যাহার করে নিতে তিনি সম্মত হলেন না।

পরের মাসে আকস্মিক বজ্রপাতের মত আর একটি ঘটনা ঘটল। ঐ একই অধ্যাপক প্রথম শ্রেণীর এক ছাত্রকে আবার টানাহেঁচড়া করলেন। প্রতিবাদ বা ধর্মঘটের মত কোন আইনসংগত উপায় নিরর্থক হবে বুঝে কয়েকজন ছাত্র নিজেদের হাতে আইন তুলে নিল। ওটেনকে খুব মারধোর করা হল। সুভাষচন্দ্র এই ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তিনি লিখেছিলেন যে ছাত্ররা অধ্যাপকের সঙ্গে সমস্তরে সাহসের সঙ্গে সরাসরি সম্মুখীন হয়েছিল।

সরকার সঙ্গে সঙ্গেই কলেজ বন্ধ করে দিল এবং কলেজে যে সমানে গোলমাল চলছে তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি

গঠন করল। এই বিশৃঙ্খলায় সরকারের সঙ্গে অধ্যক্ষের বিরোধ বাধায় তাঁকে সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত করা হয়। তিনি কার্যভার বুঝিয়ে দেবার আগেই অবশ্য সুভাষ সহ তাঁর কাল-তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছাত্রদের ডেকে পাঠান। সুভাষকে তিনি বেশ রাগতভাবেই বলেন—'বসু, কলেজের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে গোলমাল সৃষ্টিকারী ছাত্র। আমি তোমাকে সাময়িক বরখাস্ত করলাম।' বসু উত্তরে 'ধন্যবাদ' বলে বাড়ী চলে গেলেন। কলেজের গভর্নিং বডি অধ্যক্ষের আদেশ বহাল করে তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করলেন। তিনি অন্য কোন কলেজে পড়াশুনা করার অনুমতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করেছিলেন; কিন্তু সে আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। ফলে কার্যতঃ তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হল।

তদন্ত কমিটিতে তিনজন ইংরাজ ছাড়া দু'জন ভারতীয়ও ছিলেন— আশুতোষ মুখার্জী এবং হেরম্বচন্দ্র মৈত্র। এই কমিটির সামনে সুভাষ ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিনি যুক্তিগ্রাহ্য এবং সহজ সত্য বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে যদিও তিনি এই আক্রমণ সমর্থন করতে পারেন না, তিনি জানতেন যে ছাত্ররা যথেষ্ট প্ররোচনার বশেই এরকম করেছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজদের উদ্ধত ও অসদাচরণ সম্বন্ধেও তিনি বিস্তৃতভাবে বলেছিলেন। কমিটির রিপোর্টে ছাত্রদের পক্ষে একটি কথাও ছিল না এবং তাতে একমাত্র সুভাষচন্দ্র বসুর নামই উল্লিখিত হয়েছিল। অতএব তাঁর ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল।

এই সময়ে কলিকাতার রাজনৈতিক আবহাওয়ার ক্রম অবনতি হচ্ছিল। ব্যাপক হারে গ্রেপ্তার চলছিল, তাদের মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বহিষ্কৃতি কিছু ছাত্রও ছিল। তাঁর পরিবার তখন ভাবলেন যে সুভাষকে কটকে পাঠিয়ে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত হবে; কারণ জায়গাটা তুলনামূলকভাবে নিরাপদ।

তিনি যা করেছিলেন সেজন্য সুভাষের মনে বিন্দুমাত্রও দুঃখবোধ ছিল না। তিনি বরং আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তৃপ্তি লাভ

করেছিলেন এই ভেবে যে, কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ করে তিনি জাতির সম্মানের জন্য দাঁড়াতে পেরেছিলেন। তিনি তখনই ঐ দুঃখজনক ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেননি। কলেজ থেকে তাঁর বহিষ্কার বাস্তবিকপক্ষে তাঁর ভবিষ্যত জীবনযাত্রা নির্ধারিত করে দিয়েছিল। সঙ্কটের সময়ে তিনি সাহসের সঙ্গে তার মোকাবিলা করতে এবং তাঁর কর্তব্য পালন করতে পেরেছিলেন। এতে তিনি আত্মবিশ্বাস এবং নেতৃত্ব গ্রহণের শক্তি লাভ করেছিলেন। তার চেয়েও বড় কথা, এই প্রথম তিনি চরিত্র এবং আত্মত্যাগের ভিত্তিতে নেতৃত্বের আস্বাদ পেলেন।

ওটেনের ঘটনার ফলে সুভাষের যে পরিবর্তন হয়েছিল, তা এসেছিল ঝড়ের মত এবং তা তাঁর অন্তরের সব কিছু ওলটপালট করে দিয়েছিল। তাঁর পিতামাতা এবং পরিবারের অন্যান্যরা তাঁর এই পরীক্ষার সময় যে তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এতে তিনি খুব স্বস্তি বোধ করেছিলেন এবং তিনি যে ঠিক কাজ করেছেন এই বিশ্বাস তাঁর হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় যে তাঁদের দলের কিছু সভ্য, যাদের সঙ্গে তিনি কাজ করতেন, মনে করেছিল যে তিনি বেশী বাড়াবাড়ি করেছেন। কিন্তু তিনি দৃঢ় সংকল্প ছিলেন এবং ফলাফল ভোগ করার জন্য মন স্থির করে ফেলেছিলেন। তিনি লজ্জা এবং আত্মসন্দেহ অনেকটা দূর করে ফেলেছিলেন।

অদূর ভবিষ্যতে পড়াশুনা চালিয়ে যাবার কোন আশা না থাকায় তিনি গভীর আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে সমাজ সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষালাভে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কাজ করার মূল্য অনেক। তাতে যতই বিপদের সম্ভাবনা বা ঝুঁকি থাক না কেন সেজন্য তিনি কর্তব্য পরাঙ্‌মুখ হতেন না। যুবকদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত এবং নৈতিক উন্নয়নের জন্য যুব সংগঠনের কাজেও তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তিনি অভিযান চালিয়েছিলেন। জাতিগত কারণে একটি অসুস্থ সাঁওতাল ছাত্রকে যখন কেউ শুশ্রূষা করতে চায়নি তখন

তাকে সেবা করে সুস্থ করে তোলার ব্যাপারে তাঁর মা প্রভাবতী তাঁর সঙ্গে যোগ দেওয়ায় তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি আবার তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে ধর্মস্থান এবং ঐতিহাসিক স্থানগুলিতে দীর্ঘ পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ধর্মীয় উৎসব এবং পূজা প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠান পরিচালনার কাজে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিতেন। যা তিনি আগে কখনও করেননি, এই সময়ে তিনি কঠোরভাবে আত্ম-বিশ্লেষণও করতেন। প্রথমতঃ তাঁর নিজের মন সম্বন্ধে জানবার জন্য এবং বিরক্তিকর স্বপ্ন ও নীচ আবেগ প্রভৃতির সূত্র খুঁজে বার করতে, যেগুলি তিনি জয় করতে চাইতেন। এক বছর পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য তিনি কলিকাতায় ফিরে এলেন। কিছু একটা হবে এই আশা করে যখন তিনি অপেক্ষা করছিলেন, সেই সময় তিনি ৪৯ তম বেঙ্গল রেজিমেণ্টে ভর্তি হবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু চোখ খারাপ হওয়ায় তিনি অযোগ্য বিবেচিত হয়েছিলেন। অবশেষে তিনি জানতে পারলেন যে যদি তিনি অন্য কোন কলেজ ঠিক করতে পারেন, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর পুনরায় ভর্তির ব্যাপারটি বিবেচনা করতে পারেন। তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আরকুহার্ট এর সঙ্গে সোজাসুজি গিয়ে দেখা করে তাঁকে বললেন যে তিনি দর্শনে অনার্স নিয়ে কলেজে ভর্তি হতে চান। অধ্যাপক আরকুহার্ট তাঁর কথাবার্তায় মোটামুটি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ভর্তি করতে রাজী হলেন এবং বললেন যে তাঁকে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষের সম্মতিপত্র আনতে হবে। এটি করে তিনি ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হলেন। ভর্তি হবার পর সুভাষ দেখলেন যে ডঃ আরকুহার্ট কেবল সহানুভূতিশীল ও সুবিবেচকই নন, দর্শনের একজন সুযোগ্য অধ্যাপকও।

বেঙ্গল এ্যম্বুলেন্স কোরের যে দলটিকে যুদ্ধের সময় মেসোপটেমিয়ায় পাঠান হয়েছিল এবং পরে যাদের যুদ্ধবন্দী হিসাবে তুর্কীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই দলেরই অবসরপ্রাপ্ত একজন অফিসারের সঙ্গে ১৯১৬ সালে সুভাষের দেখা হয়। এই অফিসারের কাছে তাঁদের

দুঃসাহসিকতার গল্প শুনে তিনি বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন এবং সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। ইণ্ডিয়া ডিফেন্স ফোর্স বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনীর একটি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট খুলতে ভারত সরকার সম্মত হয়েছিলেন। এই সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার নিয়মাবলী সাধারণ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার মত কঠিন না হওয়ায় সুভাষ এতে ভর্তি হতে পেরেছিলেন। এখানে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তা তাঁর জীবনে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। স্কটল্যাণ্ডের একজন রুক্ষ ব্যক্তি ক্যাপ্টেন গ্রে ছিলেন প্রশিক্ষণ অফিসার। ফোর্ট উইলিয়মের স্টাফ অফিসাররা প্রথমে ভেবেছিলেন যে বাঙ্গালী ছেলেরা সেনা হিসাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। কিন্তু চারমাসের শিবির জীবনের এবং তিন সপ্তাহের মাস্কেট-বন্দুক চালনা অভ্যাসের পর এই ছেলেরা তাঁদের শিক্ষকদের ছাড়িয়ে গেল। এই প্রশিক্ষণ সুভাষের মনে নতুন শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিল। তিনি যখন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ফোর্ট উইলিয়মের ভেতরে মার্চ করে যেতেন, তখন তাঁর মনে হত যে তাঁরা এমন কিছু জিনিষের অধিকার নিচ্ছেন, যাতে তাঁদের স্বাভাবিক অধিকার আছে এবং যা থেকে তাঁরা অন্যায়ভাবে বঞ্চিত।

কলেজের তৃতীয় বছরটা তার সৈন্যদলেই কাটল। চতুর্থ বছরে সুভাষ খুব মন দিয়েই পড়াশুনা করলেন এবং ১৯১৯ সালে বি. এ পরীক্ষায় দর্শনে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। এর মধ্যে দর্শনে তাঁর মোহের অনেকটা দূর হয়েছিল এবং তিনি পরীক্ষামূলক মনস্তত্ব বিষয়ে নতুনভাবে আগ্রহী হয়েছিলেন। সুতরাং তিনি এম. এ তে এই নতুন বিষয়টি নেবেন ঠিক করলেন।

একদিন বিকালে বাবা তাঁর ঘরে তাঁকে ডেকে পাঠালেন; সেখানে তিনি মেজদাদা শরৎচন্দ্রকেও দেখলেন। জানকীনাথ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্য বিলাতে যেতে রাজী আছেন কি না? মনস্থির করার জন্য তিনি সুভাষকে চব্বিশ ঘন্টা সময় দিলেন। সুভাষ খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি নিজের মনের সঙ্গে পরামর্শ করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই প্রস্তাবে

সম্মত হবেন স্থির করলেন। অবস্থা বিশেষের চাপে আবার তাঁর সব পরিকল্পনা বদলে গেল। তিনি কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নি যে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরী করবেন। যাই হোক, সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার! এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা থেকে ইংলণ্ডে যাত্রা করবে এমন একটি জাহাজে কোনরকমে একটি বার্থ জোগাড় হল এবং অল্পসময়ের মধ্যে পাশপোর্টও পাওয়া গেল।

নিজের মানসিক সঙ্গতির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন। ইণ্ডিয়া ডিফেন্স কোর্সে যোগদান করা তাঁর দলের সঙ্গীরা পছন্দ করেন নি—সে সময় তিনি তাঁদের মতামত নেননি; এবারেও তাঁদের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করলেন না। বিদেশে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছিল তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। এর মানে হল অতীতকে ভেঙ্গে ফেলে প্রচণ্ড বেগে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

১৯১৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করলেন।

৫

সুভাষচন্দ্র যখন ইংলণ্ড রওনা হলেন তখন তিনি জানতেন যে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য তিনি মাত্র আট মাস সময় পাবেন। তার ওপর, তাঁর বয়সের জন্য এইটিই হবে প্রথম ও শেষ সুযোগ। কেম্‌ব্রিজে কোন ভাল কলেজে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারেও বেশ অনিশ্চয়তা ছিল। কারণ যে সময় তিনি ইংলণ্ডে পৌঁছবেন তার বেশ আগেই সেখানে পড়াশুনার বছর সুরু হয়ে যাবে। ইণ্ডিয়া হাউসে ভারতীয় ছাত্রদের উপদেষ্টার সঙ্গে কথাবার্তায় হতাশ হয়ে তিনি কপালে কি আছে দেখার জন্য সোজা কেম্‌ব্রিজে চলে গেলেন। সেখানে ফিট্‌জ্‌ উইলিয়াম হলের পরীক্ষক তাঁর বিষয়টি বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে তাঁকে সরাসরি ভর্তি করে নিতে এবং ১৯২১ সালের জুন মাসের ডিগ্রী পরীক্ষায় বসতে দিতে রাজী হলেন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য হাতে সময় অল্প থাকায় তিনি কার্যতঃ তাঁর সব সময়টা এই পরীক্ষার প্রস্তুতিতে লাগালেন। কেম্‌ব্রিজে মানসিক ও নীতিবিজ্ঞানে ট্রাইপোজের জন্য তিনি ক্লাশের বক্তৃতাগুলি শোনা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করলেন না। পড়াশুনা ছাড়া অন্যান্য কাজের মধ্যে তিনি ভারতীয় মজলিশ এবং ইউনিয়ন সোসাইটিতে অংশ গ্রহণ করতেন।

ইংলণ্ডে তাঁর সবচেয়ে যা ভাল লেগেছিল তা হল সেখানকার ছাত্রসমাজের স্বাধীনতা, সম্মান ও মর্যাদা। তিনি বুঝেছিলেন যে তাঁদের চরিত্রের ওপর এর একটা উপকারী ফল আছে। ভারতবর্ষে ছাত্রদের সন্দেহের চোখে দেখা হত এবং তারা ছিল কৃপা ও অবহেলার পাত্র অথবা সম্ভাব্য বিপ্লবী বলে পুলিশ তাদের অনুসরণ করত। কিন্তু ইংলণ্ডে ছাত্রদের অবস্থা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেম্‌ব্রিজে ইউনিয়ন সোসাইটির বিতর্কসভায় নির্ভয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছাত্রদের ছিল, এমন কি যদি সে সভায় মন্ত্রী অথবা পার্লামেন্টের সদস্যরা উপস্থিত থাকতেন তাহলেও। ইংরাজদের কতকগুলি সাধারণ গুণাগুণ ছিল, যা তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং এবিষয়ে তিনি দেশে বন্ধুদের কাছে চিঠিতে লিখতেন। প্রথম, তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে এবং ঘড়ির মত সঠিকভাবে কাজ করতেন ; দ্বিতীয়, তাঁরা ছিলেন প্রচণ্ড আশাবাদী এবং ভারতবর্ষের ছাত্রদের মত কেবল দুঃখ কষ্টের কথা চিন্তা না করে তাঁরা জীবনের উজ্জ্বল দিক সম্বন্ধেই বেশী চিন্তা করতেন ; তৃতীয়, তাঁদের সাধারণবুদ্ধি ছিল প্রখর, যেজন্য তাঁরা সব অবস্থাই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করতে পারতেন ; এবং শেষে, সব অবস্থাতেই তাঁরা জাতির স্বার্থকে সবচেয়ে ওপরে স্থান দিতেন এবং কখনও নিজেদের দেশকে ছোট করতেন না।

যে সময় সুভাষ কেম্‌ব্রিজে ছিলেন, ইংরাজ এবং ভারতীয় ছাত্রদের সম্পর্ক মোটামুটি ভালই ছিল। কিন্তু তা কখনো স্থায়ী এবং সত্যিকার বন্ধুত্বে পরিণত হত না। সাধারণ ইংরাজদের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠত্বের ভাব ছিল এবং ভারতীয়দের দিকে দেশের যুদ্ধোত্তর ঘটনাবলী এবং

বিশেষ করে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড তাঁদের মনে পীড়া দিত। এই হত্যাকাণ্ডের প্রধান নায়ক জেনারেল ডায়ারের প্রতি ইংরাজ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশের যে সহানুভূতি ছিল, তার জন্য ভারতীয় ছাত্ররা দুঃখবোধ করত। সুতরাং সুভাষ ও তাঁর বন্ধুরা স্বাভাবিক-ভাবেই ধরে নিয়েছিলেন যে ঐরকম পরিস্থিতিতে ইংরাজ এবং ভারতীয়দের মধ্যে সত্যিকার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার কোন ভিত্তি ছিল না, অবশ্য কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কেবলমাত্র শ্রমিকদলের সভ্যরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক যোগাযোগের অভাব ছাড়াও, এমনকি সুভাষের ইংরাজ বন্ধুদের মধ্যেও কয়েকজনের রক্ষণশীল চিন্তাধারা ছিল। ইউনিভার্সিটি ট্রেণিং কোরে যোগদানের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করায় তাঁরা যখন আবেদনপত্র পেশ করেছিলেন তখন জাতিগত কারণে ভারতীয় ছাত্রদের ওপর অবিচারের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ইণ্ডিয়া অফিস এবং ওয়ার অফিসের মধ্যে বিষয়টি চালাচালি হয়েছিল ; ভারতীয়দের নেওয়ার বিষয়ে আপত্তি জানানোর জন্য একে অপরকে দোষারোপ করেছিল। সরকারে ভারতের জন্য ভারপ্রাপ্ত আণ্ডার সেক্রেটারীর কাছে এই বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সময় সুভাষ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ছিল যে অফিসার্স ট্রেণিং কোরের সদস্যরা একবার যোগ্য বিবেচিত হলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত হবার উপযুক্ত হতেন। তাঁরা এরকম নিয়োগ চাইবেন না এবং তাঁরা যে কেবল শিক্ষালাভেই আগ্রহী ছিলেন, ভারতীয় ছাত্ররা এই আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ তাঁদের কথা শুনলেন না।

ইংলণ্ডে সুভাষ যেভাবে জীবন যাপন করতেন তাঁর বন্ধুদের মনে হত তা গোঁড়া ও পুরোনো মনোভাবাপন্ন। যে দুটি নির্দিষ্ট কাজ তাঁর ছিল—একই সঙ্গে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য এবং কেম্‌ব্রিজ ট্রাইপোজ এর জন্য তৈরী হওয়া, তা করে তিনি আর বিশ্রামের জন্য মোটেই সময় পেতেন না। বিদেশে বহু ভারতীয় ছাত্রের জীবনযাত্রার

যে ধারা পরিশেষে তাদের জীবন নষ্ট করে দিয়েছিল, সুভাষের মানসিক গঠন জীবনের সেই তুচ্ছ এবং চপল দিকটির প্রতি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিল। সকলে বলত যে সুভাষের ব্যক্তিগত উপস্থিতি একেবারে বিপথগামী ছাত্রদের মধ্যেও শান্তভাব নিয়ে আসত। ইংলণ্ডের জীবনযাত্রা ও অবস্থার খবরাখবর এবং তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে তিনি দেশে তাঁর বন্ধুদের নিয়মিত চিঠিপত্র লিখতেন।

যখনই কোন বিশিষ্ট ভারতীয় ইংলণ্ডে যেতেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বা ভারতীয় মজলিসে বক্তৃতা দিতেন, সুভাষ ছিলেন সে সবের উৎসাহী ব্যবস্থাপক। কোন ভারতীয় পরিব্রাজক ও বক্তা যখন সম্মানলাভ করতেন, তখন তিনি খুব গর্ববোধ করতেন। উদাহরণস্বরূপ, ভারতবর্ষে এক বন্ধুর কাছে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে সরোজিনী নাইডুর একটি বক্তৃতার উল্লেখ করে তিনি লিখেছিলেন যে তাঁর পাণ্ডিত্য, অনুপ্রেরণা ও মানসিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার পরিচয় পেয়ে এবং পাশ্চাত্ত্যজগতে একজন ভারতীয় মহিলাকে নিজের মর্যাদা আদায় করে নিতে দেখে তিনি কিরকম অভিভূত হয়েছিলেন।

বাস্তব জীবনে দেশের শাসনকাজ ঠিকমত করতে পারার পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করার জন্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ছাত্রদের অনেকগুলি বিষয় পড়াশুনা করতে হত। নয়টি প্রধান বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইংলণ্ডের ইতিহাস এবং আধুনিক ইয়োরোপীয় ইতিহাস। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য তৈরী হবার সময় ইংলণ্ডে আধুনিক ইয়োরোপীয় ইতিহাস তিনি বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পড়েছিলেন এবং তারপরই তিনি ইয়োরোপীয় মহাদেশের রাজনীতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করতে পেরেছিলেন। অনেকদিন ধরে সুভাষের মনে হয়েছিল যে ভারতীয়দের ইংরাজের চোখ দিয়ে ইয়োরোপীয় মহাদেশকে দেখতে শেখানো হয়েছিল। মহাদেশের ইতিহাসের আসল উৎস সম্বন্ধে পড়াশুনা করে সুভাষচন্দ্র আন্তর্জাতিক রাজনীতির আভ্যন্তরীণ নীতি বিষয়ে যথাযথ বিচার করতে পেরেছিলেন। পরবর্তী জীবনে তা তাঁর বিশেষ কাজে লেগেছিল।

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস-এর খোলা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ১৯২০ সালের জুলাই মাসের গোড়ার দিকে আরম্ভ হয়ে প্রায় একমাস ধরে চলেছিল। সুভাষ কলিকাতায় তাঁর পরিবারকে জানিয়েছিলেন যে তিনি এই পরীক্ষায় পাশ করতে পারবেন বলে মনে করেন না। তাই তিনি পরের বছরে কেম্‌ব্রিজ ট্রাইপোজ পরীক্ষা দেবার জন্য ভালভাবে তৈরী হবেন ঠিক করলেন। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি একদিন গভীর রাত্রে তাঁর সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর এক বন্ধুর টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি বেশ অবাক হয়েছিলেন। পরের দিন সকালে খবরের কাগজে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের নামের তালিকায় তাঁর নাম দেখলেন। তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁর মার্ক-শীটে পরে দেখা গেল যে তিনি ইংরাজী কম্পোজিসনে প্রথম হয়েছেন। তখনকার সময়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতীয় তরুণদের শেষ স্বপ্ন এবং তাদের পরিবারের বুক-কাঁপানো তথাকথিত 'স্বর্গজাত' এই চাকরী এভাবে তাঁর হাতের মধ্যে এসে গেল।

৬

কথাটা পরস্পর বিরোধী শোনালেও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সুভাষের সাফল্য তাঁকে জীবনের সবচেয়ে বড় সঙ্কটের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল। তিনি বুঝলেন যে জীবনে এই প্রথম আসল পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন—তিনি তাঁর নিজস্ব আদর্শ ও নীতিকে ধরে থাকবেন, না 'স্বর্গজাত' ঐ চাকরীর প্রলোভনের কাছে বশ্যতা স্বীকার করবেন? তিনি তাঁর মেজদাদা শরৎচন্দ্রকে অনেকগুলি চিঠিপত্র লিখলেন—এই চিঠিগুলিতে তাঁর মনের সব কথা খোলাখুলি তাঁকে জানিয়ে তাঁর মতামত ও পরামর্শ চাইলেন। চাকরী থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেবার পর তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকেও চিঠি লিখলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে তিনি জাতির সেবায় কাজ করতে চান এই প্রস্তাব দিলেন।

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯২১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তাঁর মনের মধ্যে যে কি প্রচণ্ড সংগ্রাম চলেছিল মেজদাদার কাছে লেখা চিঠিগুলি থেকে তা বোঝা যায়; তিনি তখন দ্বিমুখী দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাবার চেষ্টা করছিলেন—একদিকে জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ এবং অপরিসীম দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্যের জীবন আর অন্যদিকে সিভিল সার্ভিসের আরামের চাকরী। দীর্ঘ সাত মাস ধরে তাঁর পারিবারিক দায়দায়িত্ব এবং আর্থিক বিষয়ের সম্ভাব্য সবরকম দিকগুলি তিনি বিশেষভাবে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি জানতেন তাঁর পদত্যাগের ব্যাপারটি পরিবারের অধিকাংশরাই ভাল চোখে দেখবেন না। তাঁর বাবা জানকীনাথ ভেবেছিলেন দশ বছরের মত সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত শাসন আসবে। তিনি তাই এও ভেবেছিলেন যে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোন ভারতীয়ের কাছে সিভিল সার্ভিসের জীবন নতুন শাসনতন্ত্রে অসহনীয় হবে না। সুভাষ প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন যে ভারতবাসীরা দশ বছরে বা তার আগেই স্বায়ত্ত শাসন পেতে পারে, কেবল যদি তারা তার মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে। তাঁর মতে এই মূল্য মানে সেবা, আত্মত্যাগ এবং দুঃখবরণ। অতএব এই পরিস্থিতিতে যদি আমরা বিদেশী আমলাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করি এবং এক তুচ্ছ লাভের বিনিময়ে নিজেদের বিক্রী করে দিই, তাহলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এগিয়ে না এসে পেছিয়ে যাবে। তাঁর কাছে মূল প্রশ্ন হল—স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপ দেওয়া এবং সেবা, সংগ্রাম এবং ত্যাগ বরণ করে নেওয়া অথবা ভারতবর্ষের শাসক বিদেশী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ।

সুভাষ জানতেন যে তাঁদের পরিবারের অনেকেই তাঁকে 'খামখেয়ালী' বলে মনে করতেন। তাঁর এই পদত্যাগের সিদ্ধান্তে বাড়ীতে কিরকম সোরগোল পড়ে যাবে, তা তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। এরকম পারিবারিক বা সামাজিক বাধাবিপত্তি নিয়ে তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন হননি। তিনি লিখে গেছেন—'আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিশেষ কেউই আমার খামখেয়ালী সিদ্ধান্তের সমর্থন না করলেও

তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে তিনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁর মেজদাদা শরৎচন্দ্র তা সমর্থন করবেন—প্রতিটি সঙ্কটের সময় তিনি যা করেছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তে তাঁর বয়স্ক বাবা ও মা যে দুঃখ পাবেন সেকথা ভেবে তিনি বেশ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বেদীতে তাঁর সন্তান এইটুকু ত্যাগের অর্ঘ নিয়ে দেশের স্বার্থে এগিয়ে আসুক, আর এই ত্যাগ করতে হবে সচেতনভাবে এবং বেশ চিন্তা করে—একথাটা বাবা-মাকে বুঝিয়ে বলার ভার তিনি মেজদাদার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি মেজদাদাকে লিখেছিলেন যে বিদেশে তাঁর শিক্ষার জন্য যে অর্থ তিনি ব্যয় করেছেন, তার বদলে কোন কিছু পাবার প্রত্যাশা না করে সেটা দেশমাতার চরণে প্রদত্ত উপহার হিসাবে যেন তিনি ধরে নেন। যথারীতি তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেবার প্রায় তিন সপ্তাহ আগে ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে মেজদাদাকে লেখা চিঠিতে মৌলিক নীতিজ্ঞান ও সুবিধাবাদের মধ্যে তাঁর মনে যে কোন মীমাংসা করা সম্ভব নয় তা সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আরও লিখেছিলেন—'আমরা যারা একদিকে স্বামী বিবেকানন্দর এবং অন্যদিকে অরবিন্দ ঘোষের প্রভাবে বড় হয়ে উঠেছি, তাদের সৌভাগ্যক্রমে বা দুর্ভাগ্যক্রমে এমন একটা মানসিকতা গড়ে উঠেছে যাতে সম্পূর্ণ বিপরীত দুই মতবাদের সঙ্গে আপোষ করা সম্ভব নয়।' তিনি শান্তিপূর্ণ একটি পরিবারে বিরোধ সৃষ্টি করতে চলেছেন বলে দুঃখিত হয়েছিলেন। কারণ কতকগুলি মতামত তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়েছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে যেগুলি অন্যদের গ্রহণযোগ্য ছিল না।

১৯২০ সালের আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতামূলক ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সাফল্যমণ্ডিত শিক্ষানবীশদের তালিকা থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে তিনি ১৯২১ সালের ২২শে এপ্রিল সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া ই. এস. মণ্টাগুর কাছে চিঠি পাঠিয়ে দিলেন।

চাকরীটি নেবেন না এবিষয়ে মোটামুটি মন স্থির করার পর

সুভাষচন্দ্র ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে দুটি ঐতিহাসিক চিঠি লিখেছিলেন। ১৯১৬ সালে ওটেনের ঘটনার পর একবার অল্পক্ষণের জন্য তাঁর চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছিল। এখন সুভাষ দেশবন্ধুকে 'বাঙ্গলা দেশে স্বদেশ সেবা যজ্ঞে প্রধান ঋত্বিক' বলে সম্বোধন করেছিলেন এবং জাতির সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠন সম্বন্ধে তিনি পরিষ্কারভাবে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে প্রথমতঃ কংগ্রেসের নিজস্ব একটি বাড়ী থাকা অবশ্য প্রয়োজন; দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেসের একটি গবেষক ছাত্রের দল থাকা প্রয়োজন, যারা বিভিন্ন সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে যাবে; প্রচলিত মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবস্থা সম্বন্ধেও কংগ্রেসকে তার নীতি পরিষ্কারভাবে বলতে হবে; তৃতীয়তঃ দেশীয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধে কংগ্রেসের চূড়ান্ত নীতিও সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে; চতুর্থতঃ পুরুষ ও নারীর অবারিত ভোটাধিকার সম্বন্ধে কংগ্রেসের মতামত পরিষ্কারভাবে জানান উচিত; পঞ্চমতঃ অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্যে কংগ্রেস কি পরিকল্পনা করছে তা ঘোষণা করতে হবে। সুভাষচন্দ্র শেষে দেশবন্ধুকে জানিয়েছিলেন যে উল্লেখিত কাজগুলি সম্পাদনের জন্যে কংগ্রেসকে স্থায়ী কর্মীর দল রাখতে হবে এবং সংগৃহীত তথ্যগুলি সংকলন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, যেগুলির ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি সমস্যা সম্বন্ধে কংগ্রেসের নীতি নির্ধারিত হবে। সুভাষ চেয়েছিলেন যে কংগ্রেসের একটি সংবাদ সংগ্রহের বিভাগ এবং একটি প্রচার বিভাগ খোলা হোক। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি বিষয়ে ভারতবর্ষের সব ভাষায় পুস্তিকা প্রকাশ করতে হবে।

দেশবন্ধুর কাছে সুভাষ প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে তিনটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তিনি কাজ করতে পারবেন: প্রথম, দেশবন্ধু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল কলেজে শিক্ষকতা; দ্বিতীয়, সাংবাদিকতা—বিশেষ করে তাঁর সংবাদপত্র 'স্বরাজে'র ইংরাজী সংস্করণে এবং তৃতীয়, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গবেষণার কাজ। সবশেষে তিনি দেশবন্ধুকে

লিখেছিলেন যে ভারতবর্ষের ভবিষ্যত সংবিধান সম্বন্ধে কংগ্রেসের একটি সংকল্পবদ্ধ নীতি থাকা উচিত। তিনি তাই জোর দিয়ে বলেছিলেন যে পূর্ণ স্বরাজের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের নতুন সংবিধান রচনার কাজে তাঁদের এগিয়ে যেতে হবে।

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ ইংলণ্ডের ভারতীয় সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। এই সংবাদ দ্রুত ভারতবর্ষেও ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সারা দেশে একটি উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়েছিল। সুভাষ নিজে চাঞ্চল্য এবং সাধারণের প্রশংসা দুটিই এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন—তিনি চেয়েছিলেন এটি একটি নীরব আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত হয়ে থাক। এমনকি তাঁর মেজদাদা শরৎচন্দ্রকেও তিনি লিখেছিলেন—'আপনার চিঠিপত্রে আপনি আমার সম্বন্ধে অনেক প্রশংসামূলক কথা লিখেছিলেন, কিন্তু আমি জানি যে আমি তার যোগ্য নই……আমি কেবল এটাই বলতে পারি যে আমি আপনার জন্য গর্বিত।' তিনি আরও লিখেছিলেন—'আমি জানি আমি কতজনের প্রাণে দুঃখ দিয়েছি, কত গুরুজনদের আমি অমান্য করেছি; কিন্তু এই বিপদসঙ্কুল পথে পা বাড়াবার প্রাক্কালে আমার একমাত্র প্রার্থনা—এ কাজ যেন আমাদের প্রিয় দেশের মঙ্গলের জন্য হয়।' পরিশেষে তাঁর মার একটি চিঠি পেয়ে তিনি বেশ স্বস্তি বোধ করেছিলেন। তাঁর মা লিখেছিলেন যে অন্যেরা যে যা মনে করুক না কেন, "তিনি মহাত্মা গান্ধীর আদর্শকেই বেশী পছন্দ করেন।"

শেষ সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। সুভাষচন্দ্র বসু সুবিধাবাদের সঙ্গে কোন আপোষের বিরুদ্ধে অনমনীয় ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন, আদর্শ ও নীতির পথই বেছে নিলেন। তিনি জীবনে আর পেছনে ফিরে তাকান নি।

## ৭

কেম্‌ব্রিজে মানসিক ও নীতি বিজ্ঞানে ট্রাইপোজ পরীক্ষায় সুভাষ যখন পাশ করলেন, জাতীয় সংগ্রাম তখন পুরোদমে সুরু হয়ে গেছে। আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য ১৯২১ সালের জুন মাসে তিনি তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। ১৬ই জুলাই বোম্বাই-এ নেমে সেদিনই বিকালে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলেন। আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতার কাছ থেকে তাঁর পুরো কার্যধারা সম্বন্ধে তিনি পরিষ্কার ধারণা করে নিতে চেয়েছিলেন। বিগত কয়েক বছর সুভাষ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জাতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্বন্ধে গভীরভাবে চর্চা করেছিলেন এবং তাঁর সেই চর্চা এবং চিন্তাধারার আলোকে তিনি মহাত্মাজীর মন এবং লক্ষ্য বুঝতে চেষ্টা করলেন।

গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাত করে সুভাষ প্রথমেই তাঁর বিদেশী পোষাকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। মহাত্মাজী অবশ্য ব্যাপারটি সহজ করে দিলেন এবং তারপর তাঁদের মধ্যে অনেক কাজের কথাবার্তা হল। বিপরীতধর্মী ইংরাজ সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে ধাপে ধাপে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সংগ্রামের পর পর ধারাগুলির যে পরিকল্পনা গান্ধীজী করেছিলেন, সুভাষের ইচ্ছা ছিল সেগুলি ভাল করে বোঝবার। তিনি গান্ধীজীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছিলেন এবং গান্ধীজীও তাঁর স্বাভাবিক ধৈর্যের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন। প্রশ্নগুলির বিষয় ছিল—কর বন্ধের আন্দোলন, আইন অমান্য, বিদেশী বস্ত্র বর্জন, খাদির প্রচার ও প্রসার, এক বছরের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর স্বরাজের প্রতিশ্রুতি, সরকারের আইন অমান্য করে কারাগারে গণ-অভিযান ইত্যাদি। মহাত্মাজীর কতকগুলি উত্তরে বিশেষ করে কর বন্ধ বিষয়ে সুভাষচন্দ্র সন্তুষ্ট হয়েছিলেন; কিন্তু অন্যান্য উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। সুভাষের ধারণা হল যে হয় গান্ধীজী আগে থেকেই সব কথা বলতে চান নি, অথবা যে কৌশলে ও উপায়ে আসল ক্ষমতা

দখল কার্যকরী করা যাবে, সে সম্বন্ধে তাঁর মনে পরিষ্কার ধারণা ছিল না।

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে হতাশ হয়ে তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে কলিকাতা রওনা হলেন। গান্ধীজীও চেয়েছিলেন যে তিনি কলিকাতায় দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন। কলিকাতায় পৌঁছে সুভাষ দেখলেন যে দেশবন্ধু বাইরে চলে গেছেন, তাই তাঁকে কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হল। এঁদের দু'জনের প্রথম সাক্ষাৎকার ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সুভাষ সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছিলেন যে এই মানুষটি জানেন তিনি কি চান এবং তিনি ঐ উদ্দেশ্যে তাঁর যা কিছু আছে সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন ; সেজন্য তিনি অন্যের কাছেও তাঁদের যা কিছু দেয় তা দাবী করতে পারেন। তাঁর বিশ্বাস হল যে এবার তিনি একজন সত্যিকার নেতা খুঁজে পেয়েছেন এবং ঠিক করলেন যে তাঁকেই তিনি অনুসরণ করবেন। দেশবন্ধু তাঁর নতুন তরুণ সহকারীকে দু'বাহু বাড়িয়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং তাঁকে অনেকগুলি কাজের দায়িত্বভার দিয়েছিলেন। সমগ্র দেশ তখন দেশপ্রেমের বন্যায় আন্দোলিত হচ্ছিল এবং জনগণের মধ্যে অতুলনীয় উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। তখন 'ত্রিবিধ বয়কট' চলছিল—কংগ্রেস সদস্যরা ব্যবস্থাপক সভা বর্জন করেছিলেন, আইনজীবীরা আদালত ত্যাগ করেছিলেন এবং ছাত্ররা জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। দেশবন্ধু সুভাষকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এবং জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রচার বিভাগের পূর্ণ দায়িত্বভার দিলেন। তিনি সদ্য প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষও হলেন। যে যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সুভাষ তাঁর দায়িত্বগুলি পালন করেছিলেন, তা সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছিল। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইংরাজ সরকার ১৯১৯ সালে প্রস্তাবিত এবং পরে বড়লাট চেমসফোর্ড ও ভারতের জন্য ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী মণ্টেগু কর্তৃক শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত সাংবিধানিক সংস্কারের সূচনা করার ক্ষেত্র প্রস্তুত

করছিলেন। ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে প্রিন্স অব্ ওয়েলসের ভারতবর্ষ পরিদর্শনের কথাও ঘোষণা করা হয়েছিল।

প্রিন্সের বোম্বাই পৌঁছানর নির্দিষ্ট দিন কংগ্রেস দেশবাসীকে পূর্ণ হরতাল পালন করার আহ্বান জানাল। ভারতবর্ষের অন্যান্য সহরের মত কলিকাতাও এই উপলক্ষে তার কর্তব্য পালন করল। মনে হল সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা সহরের ভার গ্রহণ করেছে। স্বেচ্ছাসেবক সংস্থাটিকে সরকার বেআইনী ঘোষণা করল এবং তার ফলে আগুনে ঘি পড়ার অবস্থা হল। কংগ্রেস কমিটি তার সমস্ত ক্ষমতা সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশকে দিয়েছিল এবং তিনি আবার সুভাষচন্দ্রের ওপর এই আন্দোলনের সব ভার দিয়েছিলেন। দেশবন্ধুর পত্নী বাসন্তী দেবী এবং সাহসী একদল মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা যখন রাজপথে আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার হলেন তখন আন্দোলনের গতি বেশ বেড়ে গেল। হাজারে হাজারে তরুণ-তরুণী এগিয়ে এল এবং কারাগারগুলি ভর্তি হয়ে উপচে পড়ল। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে বন্দী হলেন এবং পরে তাঁদের ছ'মাস কারাবাসের আদেশ হল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে জেলে একসঙ্গে আটমাস থাকার সময় সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনের সবচেয়ে আবেগপূর্ণ ও শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। কলিকাতা আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে সহবন্দী হিসাবে থাকার সময় সুভাষচন্দ্র তাঁর গুরুর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করে জনসাধারণের এবং বিশেষ করে তাঁর অনুগামীদের ওপর তাঁর বিরাট প্রভাবের গূঢ় সূত্রটি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে সুভাষের খুবই কাজে লেগেছিল; প্রথম, যখন বাঙ্গলার নেতৃত্বের দায়িত্ব তাঁর ওপর পড়েছিল; দ্বিতীয়, সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তাঁকে যখন বিকল্প নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল এবং শেষে যখন তিনি ইয়োরোপে এবং পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ আন্দোলনের অধিনায়ক হয়েছিলেন।

সুভাষের মতে জননেতা হিসাবে দেশবন্ধুর সাফল্যের মূল

কারণগুলি ছিল এইরকম : প্রথমতঃ, দেশবন্ধু তাঁর অনুগামীদের সামাজিক মর্যাদা, গুণাগুণ ও ব্যর্থতার বিচার না করে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন।

তাঁর প্রথম আবেদন ছিল মানুষের অন্তঃকরণের প্রতি। সব শ্রেণীর মানুষই তাঁর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হত, কারণ দেশবন্ধুর কাছে হৃদয়ের স্থান ছিল সবকিছুর ওপরে। দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজনের বা দুঃখদুর্দশার সময় কেউ দলভুক্ত কিনা বা তার পূর্ব পরিচয় কি এসব বিচার না করেই দেশবন্ধু সর্বতোভাবে তাঁর সহকর্মীদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। প্রতিদান স্বরূপ তাঁর অনুগামীরা এবং দেশবাসীরা তাঁর নির্দেশ পালন করার জন্য যথাসম্ভব সবরকম ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল। তাঁর অনুগামীদের সম্পূর্ণ আনুগত্য তাই তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদের ঈর্ষা ও দ্বেষের কারণ হয়ে উঠেছিল। তৃতীয়তঃ, সুভাষ দেশবন্ধুর অপূর্ব সংগঠনশক্তির পরিচয় পেয়ে বিশেষ অভিভূত হয়েছিলেন। এমন মানবগুণসম্পন্ন এক সংগঠন তিনি গড়ে তুলেছিলেন যে তা ইংরেজ সরকারেরই হোক বা তাঁর দেশবাসীর দিক থেকে হোক, সবরকম বিরোধী শক্তিরই সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারত। তাঁর দলীয় সংগঠনের মধ্যে মত প্রকাশের বা বিতর্কের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল যা প্রশংসনীয় সংযম, নিয়ম শৃঙ্খলা এবং কাজের সমন্বয় দ্বারা সংহত হত। চতুর্থতঃ, দেশবন্ধু তরুণ ও যুবকদের অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং তাদের দুঃখকষ্ট, আশা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ মিশিয়ে দিতে পারতেন।

আট মাস একসঙ্গে কারাবাসের সময় সুভাষ তাঁর সাধ্যমত পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে দেশবন্ধুর যত্ন ও দেখাশোনা করতেন। তিনি যে শুধু তাঁর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রতিটি ছোটখাট বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন তাই নয়, তিনি তাঁর জন্য রান্নাও করতেন। অনেকে তাই রসিকতা করে বলতেন—দেশবন্ধু কি ভাগ্যবান! তিনি একজন আই, সি, এস রাঁধুনী পেয়েছেন। দেশবন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার এই দুর্লভ সুযোগে সুভাষ মানুষ দেশবন্ধুকে ভালভাবে জানতে পেরেছিলেন,

যিনি রাজনীতিতে গভীরভাবে ডুবে থাকলেও যাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র ক্ষুদ্রতা ও নীচতা ছিল না। রাজনীতির চেয়ে জীবন অনেক বড়—এই সূত্রটি তিনি তাঁর নেতার কাছ থেকে শিখেছিলেন এবং তা তিনি বিশ্বাস করতেন এবং জীবনের সব পরিস্থিতিতেই মেনে চলতেন।

দেশবন্ধুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার সূত্রে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষে ফিরে আসার পরেই দেশের কয়েকজন প্রখ্যাত নেতার সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় দেশবন্ধুর বাড়ীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র সেই সময় পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, লালা লাজপত রায়, মৌলানা মহম্মদ আলির মত তিনজন চিন্তাশীল বিরাট মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, যাঁরা দেশবন্ধুর সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনে মহাত্মাজীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

ভারতে পৌঁছবার আগেই অসহযোগ আন্দোলনের আদর্শবাদ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এক বিশেষ ও তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা সুভাষের হয়েছিল, যা এখানে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষের জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সঙ্গে একই জাহাজে দেশে ফিরছিলেন। প্রচলিত বিশ্বাস ভিন্ন হলেও সুভাষের ধারণা হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ অসহযোগ আন্দোলনের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে ছিলেন না, যদিও এবিষয়ে তাঁর বিশেষ কিছু চিন্তা ও বক্তব্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করে এই মত পোষণ করতেন যে কংগ্রেসের আরও গঠনমূলক কাজ হাতে নেওয়া উচিত যাতে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতায় ও সমর্থনে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের মধ্যে আর একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায়। রবীন্দ্রনাথ যা প্রস্তাব করেছিলেন আর সুভাষ আইরিশ সিন্ ফিন্ আন্দোলনের গঠনমূলক দিক সম্বন্ধে যা পড়েছিলেন এবং যার সঙ্গে তাঁর মতের সম্পূর্ণ মিল ছিল, তা প্রায় একই। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতির ঐক্য ও সমন্বয়ের চিন্তাধারা এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে পশ্চিমের বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতার যোগসূত্র খুলে রাখার প্রস্তাব

সুভাষচন্দ্র মেনে নিয়েছিলেন, যা কিনা অসহযোগ আন্দোলনের কোন কোন প্রবক্তা মেনে নেন নি।

৮

১৯২১ সালের মাঝামাঝি থেকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশঃ উত্তাল হতে হতে বছরের শেষের দিকে ঝড় উঠল। অসহযোগ আন্দোলনের ঝড়ের কেন্দ্র ছিল কলিকাতা। গান্ধীজীর সার্বিক নেতৃত্বে যে অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল, বাঙ্গলার মেদিনীপুর জেলার কর বন্ধ আন্দোলন, পাঞ্জাবের আকালি আন্দোলন এবং মালাবারের মোপলা বিদ্রোহ তার পরিপূরক হল। অসহযোগ এবং খিলাফত—এই যুক্ত আন্দোলন ইংরাজ সরকারকে বেকায়দায় ফেলেছিল। যদিও এক বছরের মধ্যে, অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২১ এর মধ্যে, স্বরাজের প্রতিশ্রুতি পূরণের কোন লক্ষণ দেখা যায় নি, জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি তাদের শক্তি সম্বন্ধে এতই নিশ্চিত ছিল যে মহাত্মাজী নতুন বড়লাট লর্ড রিডিং-এর কাছে চরম প্রস্তাব পাঠালেন যে শাসকরা যদি মনের পরিবর্তন না দেখায় তাহলে তাঁর কার্যসূচীর শেষ ধাপ অর্থাৎ কর বন্ধের দিকে তিনি এগিয়ে যাবেন। বাঙ্গলা সহ সারা দেশে সংগ্রামের ডাক এলেই আন্দোলন সুরু করার সব ব্যবস্থা করা হল; আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও ভারতবর্ষের সংগ্রামের অনুকূল হল। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের গোড়া থেকেই দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্র ও তাঁর অন্য ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের সঙ্গে জেলে ছিলেন।

এই অবস্থায় নতুন ইংরাজ বড়লাট পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে শান্তির দূত হিসাবে জেলে গিয়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে মীমাংসার শর্তাবলী ঠিক করার জন্য পাঠালেন। চিত্তরঞ্জন দাশ সুভাষ এবং অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করলেন এবং এই সময়ে একটি মীমাংসা যে তাঁদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে তার এই মতের সমর্থনে অনেক যুক্তি দেখালেন। মীমাংসার

শর্তাবলী মেনে নেওয়ার জন্য সুপারিশ করে দেশবন্ধু এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ গান্ধীজীর কাছে একটি যুক্ত টেলিগ্রাম পাঠালেন। কলিকাতা এবং সবরমতীর মধ্যে অনেক টেলিগ্রাম আদান-প্রদান হল। দেশবন্ধু ইংরেজের প্রস্তাবকে ঈশ্বরের দান বলে মনে করলেও গান্ধীজী সব শর্তগুলি সম্বন্ধে খুশি হন নি। ফলে একটি অচলাবস্থার সৃষ্টি হল।

১৯২১ সালের শেষার্ধে বাঙ্গলায় কংগ্রেসের অনেক অগ্রগতি হয়েছিল এবং তাতে ছিল সুভাষচন্দ্রের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। গান্ধীজী দলকে একটি নতুন সংবিধান দিয়েছিলেন, যার ফলে সংগঠনটি গণভিত্তিক হয়েছিল। তিরঙ্গা পতাকাটি সত্যিই জাতীয় পতাকা বলে স্বীকৃতি লাভ করল এবং সর্বত্রই একই শ্লোগান শোনা যেতে লাগল। খাদি হল জাতীয় পোষাক এবং একই নীতি ও আদর্শবাদ বাঙ্গলায়, মহারাষ্ট্রে, পাঞ্জাবে, মাদ্রাজে সর্বত্রই গৃহীত হল। বাঙ্গলায় এই পরিবর্তনের মুখে দেশবন্ধু বিশেষ কাজের জন্য বেছে নিলেন খানিকটা ভারতীয় ও খানিকটা ইয়োরোপীয় মুখাবয়বের চব্বিশ বছরের সুদর্শন, গৌরকান্তি, প্রশস্ত ললাট, তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সদা শুভ্র খদ্দর পরিহিত এই যুবককে। তিনি ছোট মাপের রাজনীতিক ছিলেন না—দেশবাসী শিক্ষাদীক্ষায় তাঁর কৃতিত্বের এবং তাঁর মানসিক শক্তির কথা জানতেন এবং আই-সি-এসের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ত্যাগস্বীকারের ক্ষমতার পরিচয়ও তিনি দিয়েছিলেন। জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠনে এবং জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তোলায় তাঁর বিশেষ ভূমিকায় তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় পেয়ে তাঁর নেতা তাঁকে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সংগঠনের বিশেষ দায়িত্বভার দিলেন ; প্রথম ১৯২১ সালে 'বাঙ্গলার কথা', তার পর এল ১৯২২ সালে 'আত্ম শক্তি' এবং ১৯২৩ সালে 'ফরওয়ার্ড'। দক্ষিণ কলিকাতায় তাঁর নিজের এলাকায় দক্ষিণ কলিকাতা সেবাসমিতি এবং দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি সামাজিক উন্নয়নের কাজেও সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে লাগলেন।

১৯২২ সাল আরম্ভ হল অনিশ্চিত কিন্তু উত্তেজনাকর অবস্থার মধ্যে। একদিকে বড়লাট তাঁর মীমাংসার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিলেন, আর অন্যদিকে মহাত্মাজী সঙ্গে সঙ্গে গুজরাটের বার্দোলীতে কর বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করার চরমপত্র দিলেন। হঠাৎ যেন বজ্রপাত হল। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারীর গোড়ায় যুক্ত প্রদেশের চৌরী চৌরায় গ্রামবাসীরা প্রচণ্ড উত্তেজনার মুহূর্তে একটি থানায় আগুন লাগিয়ে দিলেন এবং কয়েকজন পুলিশকে মেরে ফেললেন। ঘটনার এই গতি পরিবর্তনে গান্ধীজী দারুণ আঘাত পেলেন এবং তাঁর কথায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আইন অমান্য আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখলেন। সেই সময় সুভাষ দেশবন্ধুর সঙ্গে জেলে ছিলেন। আন্দোলন স্থগিত হয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে তাঁরা দুঃখে এবং বিরক্তিতে ফেটে পড়লেন। হঠাৎ এই পশ্চাদপসরণে কংগ্রেসীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন এবং উজ্জ্বল আশাবাদের বদলে হতাশা তাঁদের অভিভূত করল। বড়লাট লর্ড রিডিং এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে আক্রমণাত্মক নীতি নিলেন। রাজদ্রোহের অভিযোগে মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হল এবং তাঁর দীর্ঘ কারাবাসের আদেশ হল। দেশবন্ধু এই গণ-আন্দোলন সাময়িক স্থগিত রাখাকে বাস্তব সত্য বলে মেনে নিলেন এবং জেলে বসে বসে সংগ্রামের এক নতুন পরিকল্পনা উদ্ভাবনায় আত্মনিয়োগ করলেন যাতে করে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করে অসহযোগ এবং সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনে আমরা কিছু সুবিধাজনক জায়গা দখল করে নিতে পারি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আইন অমান্য সম্বন্ধে একটি তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করলেন এবং সদস্যরা সমান-সমান দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেলেন—একদল দেশবন্ধুর পরিকল্পনার পক্ষে এবং আর এক দল ব্যবস্থাপক সভার বাইরে থাকার বা 'নো-চেঞ্জার' মতের সমর্থক। সুভাষ তাঁর আনুগত্য বজায় রেখে তাঁর নেতার পাশেই রইলেন।

১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাঙ্গলার উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতে বিধ্বংসী বন্যা হয়েছিল। কংগ্রেস বন্যাত্রাণের কাজে নেমে পড়ল এবং

সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রথম দলটি বন্যাপ্রপীড়িত নরনারীর উদ্ধারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুভাষের পরিচালনায় বন্যাত্রাণের কাজ খুব সাফল্য লাভ করায় কংগ্রেসের মর্যাদা অনেক বেড়ে গিয়েছিল; সরকারী প্রচেষ্টা ছিল অপ্রতুল ও আন্তরিকতাহীন।

১৯২২ সালের দ্বিতীয়ার্ধে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছিল, দেশবন্ধুর প্রধান সহযোগী হিসাবে সুভাষের পক্ষে যা ছিল সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমটি, দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন। এই সম্মেলনেই দেশবন্ধু পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে, যে স্বরাজ অর্জন করার জন্য তাঁরা চেষ্টা করছেন তা হল দেশের সাধারণ মানুষের জন্য, যারা হল জনসংখ্যার শতকরা ৯৮ ভাগ। এইভাবে ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে সুভাষ যুক্ত হলেন এবং তাঁর নেতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি ১৯৩১ সালে যে কেবল নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি হলেন তাই নয়, তিনি জামসেদপুরের টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর লেবার এসোসিয়েশনের সভাপতিও হলেন; প্রায় দশবছর আগে তাঁর নেতা এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি হল কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ইয়ং মেন্‌স কনফারেন্স, যা ছিল বাঙ্গলার যুব আন্দোলনের অগ্রদূত এবং অনতিবিলম্বে যার অবিসংবাদী নেতা হয়ে উঠলেন সুভাষচন্দ্র। এই দশকের শেষের দিকে ভারতবর্ষের যুব আন্দোলন দুই দিশারী সুভাষচন্দ্র বসু এবং জহরলাল নেহরুর নির্দেশনায় একটি বিশেষ শক্তি হিসাবে গড়ে উঠেছিল।

১৯২২ সালের শেষ দিকে কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একটি সভা হয়েছিল—এটি ছিল ডিসেম্বরে গয়ায় অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক অধিবেশনের প্রস্তাবনা স্বরূপ; দেশবন্ধু এই অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কলিকাতার সভায় দেশবন্ধুর অনুগামী 'প্রো-চেঞ্জার' এবং গান্ধীজীর সমর্থক 'নো-চেঞ্জার'—যাঁরা কোন অবস্থাতেই ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের বিরোধিতা করতেন—এই দুই দলের শক্তি পরীক্ষা হয়েছিল।

গয়ার কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র যোগদান করেছিলেন; এই কংগ্রেসে দেশবন্ধুর প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। তাই সভাপতি হিসাবে তাঁর অবস্থা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ল। পরবর্তী বছরের জন্য কংগ্রেসের কার্যসূচী প্রণয়নের যখন সময় এল, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সকলকে অবাক করে দিয়ে সভাপতির কার্যসূচী রূপায়িত করার জন্য কংগ্রেস থেকে আলাদাভাবে স্বরাজ্য পার্টি গঠনের কথা ঘোষণা করলেন। দেশবন্ধু যেহেতু পার্টির রীতি অনুযায়ী গৃহীত প্রস্তাবগুলির বিপক্ষে কাজ করতে চেয়েছিলেন, সেজন্য সভাপতি হিসাবে তিনি পদত্যাগ করলেন। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, স্বরাজ্য পার্টির সদস্যেরা 'হার মেনে ফিরে এলেন, কিন্তু তাঁরা লড়ে শেষ পর্যন্ত জিতবেন এই সঙ্কল্প তাঁদের ছিল।'

৯

সুভাষ এবং দেশবন্ধুর অন্যান্য অনুগামীরা গয়া কংগ্রেস থেকে কিছুটা বিষণ্ণ মনে বাঙ্গলায় ফিরে এলেন। তাঁরা দেখলেন যে তাঁদের অবস্থা অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে, কারণ সেই সময় সংখ্যাধিক্য হওয়ায় বাঙ্গলায় পার্টির কর্তৃত্ব 'নো-চেঞ্জার'দের হাতে চলে গিয়েছিল। তাঁদের হাতে সঞ্চিত অর্থও ছিল না। কিন্তু স্বরাজ্যদলের সভ্যেরা কেবল দৃঢ় সংকল্প, কঠিন শ্রম ও কংগ্রেসীদের মধ্যে জোরদার প্রচার চালিয়ে নিশ্চিতভাবে অগ্রসর হতে লাগলেন। সুভাষ ও তাঁর সহকর্মীরা একেবারে ময়দানে নেমে সাধারণের মধ্যে কাজ করতে লাগলেন এবং দেশবন্ধু ও পণ্ডিত মতিলাল দেশের বিভিন্ন অংশে সফরে বেরোলেন। ১৯২৩ সালের মাঝামাঝি স্বরাজ্যপন্থীরা 'নো-চেঞ্জার'দের প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠলেন। শেষে সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশনে তাঁরা জয়লাভ করলেন এবং কংগ্রেসীদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার এবং ব্যবস্থাপক সভার ভিতরে গিয়ে ধারাবাহিকভাবে এবং ক্রমাগত বিরোধিতা

করার অনুমতি দিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হল। নির্বাচনে স্বরাজ্য দল উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করলেন। কেন্দ্রীয় এসেমব্লীতে পণ্ডিত মতিলাল এবং বাঙ্গলা কাউন্সিলে দেশবন্ধু পার্টির নেতা হলেন। দিল্লী কংগ্রেসের পর দেশবন্ধু কলিকাতায় তাঁর ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র 'ফরওয়ার্ড' প্রকাশ সুরু করে সুভাষচন্দ্রকে এর পরিচালনার ভার দিলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে 'ফরওয়ার্ড' দেশের অন্যতম প্রধান দৈনিক সংবাদপত্র হয়ে উঠল।

সুভাষ একদিকে স্বরাজ্যপার্টির সমস্ত কার্যকলাপে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা নিলেন আর অন্যদিকে তিনি তাঁর যুব সংগঠনের পরিকল্পনা নিয়েও এগোতে লাগলেন। তিনি অল বেঙ্গল ইয়ুথ লীগ গঠন করলেন এবং তার সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ঐ লীগ সারাদেশে ঐ ধরণের যুব সংগঠনের আদর্শ স্বরূপ হয়ে উঠেছিল। সুভাষচন্দ্র বসু পরিকল্পিত যুব সংগঠনের এই উদ্দেশ্য ছিল না যে যুবশক্তিকে কেবলমাত্র কোন রাজনৈতিক দলের সংযোজক হিসাবে ব্যবহার করা অথবা শুধু বিক্ষোভ আন্দোলনের রাজনীতি করার কাজে লাগান হবে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের যুবকদের দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিগত দিক ও মনস্তাত্বিক দিক দিয়ে গড়ে তোলা যাতে তারা ভারতীয় সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে পারে এবং একটি নতুন ভারত গড়ে তুলতে পারে, যা ভবিষ্যতে পৃথিবীর কাছে ভারতের শাশ্বত ঐতিহ্যের বাণী পৌঁছে দিতে পারবে। এই আদর্শে যাতে যুবশক্তিকে গড়ে তোলা যায় এজন্য সুভাষচন্দ্র বাঙ্গলার প্রতিটি জেলায় এবং অঞ্চলে তরুণ-তরুণীদের ক্লাব এবং সঙ্ঘ গঠন করায় উৎসাহ দিতেন।

১৯২৩ সালের শেষ ভাগে পার্টি সংগঠনে সুভাষচন্দ্রকে একটি মুখ্য পদ দেওয়া হল—তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক হলেন।

১৯২৪ সাল স্বরাজ্যপন্থীদের পক্ষে আশার সঙ্কেত নিয়ে এল। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচন ঘোষিত হল এবং

ঠিক হল যে পার্টি এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। হিন্দু এবং মুসলিম উভয় আসনগুলিতেই স্বরাজ্য পার্টি বেশ ভাল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করল। দেশবন্ধু কলিকাতার প্রথম মেয়র এবং মিঃ শহীদ সুরাবর্দী ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হলেন। দেশবন্ধুর অনুরোধে সুভাষচন্দ্র চিফ একজিকিউটিভ অফিসার অর্থাৎ মিউনিসিপ্যাল কার্য পরিচালনার প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হলেন। তাঁর এই নিয়োগ সরকারের বিরক্তির কারণ হয়েছিল এবং তারা অনেক দ্বিধা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের অনুমোদন দিয়েছিল।

দেশবন্ধুকে মেয়র এবং সুভাষকে চিফ একজিকিউটিভ অফিসার করে স্বরাজ্যপন্থীদের দ্বারা কর্পোরেশন অধিকার করায় ভারতবর্ষে নাগরিক উন্নয়নের একটি নতুন যুগ সূচিত হল। মেয়র হিসাবে দেশবন্ধুর অভিভাষণটিকে নাগরিক অধিকার, অগ্রগতি ও স্বাধীনতার দলিল বলা চলে। সুভাষচন্দ্রের কাজ ছিল কার্যসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করা। এই প্রথম খদ্দর পৌর কর্মীদের অফিসের ইউনিফর্ম হল এবং ইংরাজদের নামানুসারে নামাঙ্কিত অনেক রাস্তা ও পার্কের নাম ভারতবর্ষের মনীষীদের নামে করা হল। একজন যোগ্য এডুকেশন অফিসারের অধীনে এই প্রথম কর্পোরেশনে শিক্ষা বিভাগ খোলা হল। সারা সহরে ছেলেদের এবং মেয়েদের জন্য ফ্রি প্রাইমারী স্কুল চালু হল। স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রচার কাজ চালাবার জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে জনসাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নাগরিকদের সহযোগিতায় কর্পোরেশন পরিচালিত কয়েকটি হেলথ এসোসিয়েশন খোলা হল। গরীবদের ডাক্তারী চিকিৎসার জন্য সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ফ্রি ডিসপেন্সারীও খোলা হয়েছিল। কলিকাতার বিভিন্ন এলাকায় শিশুদের ক্লিনিক খোলা হল—এখান থেকে দুঃস্থ শিশুদের বিনামূল্যে দুধ দেওয়া হত। চিফ একজিকিউটিভ অফিসার তাঁর কার্যতালিকা অনুযায়ী কাজগুলি সেরে ফেলার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ক্ষিপ্রতা দেখিয়েছিলেন। সংরক্ষণ ব্যবস্থা, জল সরবরাহ, আলো, রাস্তা মেরামত প্রভৃতি কাজগুলি তত্ত্বাবধান করার জন্য তিনি দিনে বা রাত্রে

যে কোন সময় এখানে ওখানে সর্বত্রই যেতেন। কয়েক মাসের মধ্যে সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের কাজ পরিচালনায় একটি নতুন রূপ দিতে এবং গতি সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। খ্যাতনামা ইংরাজদের নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া বন্ধ হল এবং তার বদলে জাতীয়তাবাদী নেতারা কলিকাতায় এলে তাঁদের পৌর সম্বর্ধনা দেওয়া হত। নগরবাসীদের মধ্যে নাগরিক সচেতনতা জাগাবার জন্য সাপ্তাহিক পত্রিকা—ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট-এর প্রকাশ সুরু হল। ভারতীয় জিনিষপত্রের উন্নয়নের জন্য কমার্শিয়াল মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে তাঁর বেতনের অর্ধেক টাকা নিতেন এবং বাকি অর্ধেক দান করতেন।

স্বরাজ্য দল যখন কলিকাতা কর্পোরেশনের কাজে বেশ এগিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বেঙ্গল কাউন্সিল ও ইণ্ডিয়ান লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লীতে বাধা সৃষ্টি করার কৌশল সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছিলেন, দেশবন্ধু তখন বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটিকে বাঙ্গলার হুগলী জেলার তারকেশ্বরের মন্দির সংস্কার করা এবং গণতান্ত্রিক রীতি প্রবর্তনের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করার জন্য ডাক দিলেন ; সুভাষ তখন ঐ কমিটির সাধারণ সম্পাদক। এই আন্দোলনটি ছিল পাঞ্জাবে শিখদের পবিত্র ধর্মস্থানগুলির গণতন্ত্রীকরণের জন্য আকালি আন্দোলনের ধারায়। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা যখন তারকেশ্বরে এগিয়ে গেল, বিদেশী সরকার তখন স্বেচ্ছাচারী মোহন্তর পক্ষে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এল এবং নির্দয়ভাবে তাদের আক্রমণ করল। এই আন্দোলন বাঙ্গলায় জনগণের মধ্যে দারুণ সাড়া জাগিয়েছিল।

১৯২৪ সালের মে মাসে বাঙ্গলা কংগ্রেসের সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে দেশবন্ধু 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে খ্যাত একটি চুক্তির প্রস্তাব পেশ করেছিলেন—এটি ছিল হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একটি চুক্তি যাতে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নানা প্রশ্ন বিবেচিত হয়েছিল এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকদের চাকরীর ব্যাপারে অনেক সুবিধা ও অন্যান্য ব্যাপারেও নানা সুযোগ-সুবিধা, যা থেকে তারা দীর্ঘদিন বঞ্চিত ছিল,

সেগুলি দেওয়া হয়েছিল। অনেক বাধা সত্ত্বেও দেশবন্ধু সেদিন 'বেঙ্গল প্যাক্ট' অনুমোদন করিয়ে নিতে পেরেছিলেন। এটি উল্লেখযোগ্য যে সুভাষচন্দ্র তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে ন্যায়বিচার ও উদারতার ভিত্তিতে আন্তঃ সাম্প্রদায়িক সব প্রশ্নের মীমাংসায় তাঁর নেতার এই ঐতিহ্য অনুসরণ করেছিলেন। কলিকাতার পুলিশ কমিশনারকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন যে তরুণ ছাত্র বিপ্লবী শহীদ গোপীনাথ সাহা, তাঁর আত্মবলিদান সম্বন্ধেও সম্মেলনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল। বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ এবং সশস্ত্র সংগ্রাম সম্বন্ধেও দেশবন্ধুর এবং সুভাষের মত একই রকম ছিল। জাতীয় সংগ্রামে কোন রকম সন্ত্রাসবাদকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা তাঁরা সমর্থন করেন নি। কিন্তু আত্মবলিদানের মন্ত্রে ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ কিছু আদর্শবাদী যুবককে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে প্রায়ই সন্ত্রাসবাদের পথে আকৃষ্ট হতে দেখা যেত—এই ঐতিহাসিক সত্যকে তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে তাই এই ধরণের কার্যকলাপ ছিল অপরিহার্য বিস্ফোরণের মত। সুতরাং দেশবন্ধু এবং সুভাষ নীতিগতভাবে তাঁদের সমর্থন না করলেও ঐ সব বিপ্লবীদের দেশপ্রেম, আদর্শবাদ এবং আত্মত্যাগের প্রতি তাঁদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল।

১৯২৪ সালের মাঝামাঝি স্বরাজ্য পার্টি এবং তার নেতা দেশবন্ধুর প্রভাব ও মর্যাদা যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। আগষ্ট মাসে যখন কলিকাতায় পার্টির বার্ষিক সম্মেলন হল, তখন তাতে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল এবং যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। স্বরাজ্য পার্টি যেহেতু সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করে চলেছিল, ইংরাজ সরকার তাই আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। নিছক মরিয়া হয়ে তাঁরা তাই সংগঠনের মূলে আঘাত হানা স্থির করলেন। ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর শেষ রাত্রে সুভাষকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা হল, কারণ কলিকাতার পুলিশের ডেপুটি কমিশনার তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হলে তিনি বললেন—'মিঃ বসু,

১৮১৮ সালের তিন ধারায় আপনাকে গ্রেপ্তার করার একটি পরোয়ানা রয়েছে।' সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আর যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে স্বরাজ্য পার্টির ছ'জন বিশিষ্ট সদস্যও ছিলেন।

১০

ইংরাজ সরকার দেশে বিপ্লবাত্মক ষড়যন্ত্র চলছে এই দোহাই দিয়ে ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে বাঙ্গলায় ব্যাপক ধরপাকড়ের পক্ষে যুক্তি দেখাল। কলিকাতার ছুটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র আর একটু এগিয়ে অভিযোগ করল যে 'সুভাষচন্দ্র বসু এই বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের মাথা।' এর জন্য সুভাষচন্দ্র বসুর পক্ষ থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনা হয়েছিল। সরকার বা তাদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র তাদের অভিযোগের সমর্থনে কিছুমাত্র প্রামাণ্য তথ্য দিতে পারেনি। যাই হোক, সুভাষচন্দ্র এবং বাঙ্গলার কয়েকজন সম্ভাবনাপূর্ণ ও উদীয়মান নেতার বিনা বিচারে কারাবাস প্রায় তিন বছর চলল।

সুভাষের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কলিকাতার মেয়র হিসাবে দেশবন্ধু কর্পোরেশনে একটি অপূর্ব বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর চিফ একজিকিউ-টিভ অফিসার যা করেছেন তার সম্পূর্ণ দায়ভার তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং কম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—'দেশকে ভালবাসা যদি অপরাধ হয়, আমিও তাহলে অপরাধী······কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসারই শুধু নয়, কর্পোরেশনের মেয়রও সমান অপরাধী।'

জেলে একজন পুলিশ অফিসার ও একজন জেলকর্মীর উপস্থিতিতে সুভাষচন্দ্রকে প্রায় ছ'সপ্তাহের জন্য কর্পোরেশনের কাজকর্ম করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এইসব অফিসারদের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই গোলমাল বাধত এবং তিনি তাদের খুব ভৎসনা করতেন। এর শাস্তিস্বরূপ তাঁকে কলিকাতা থেকে দূরে বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হল। ছ'মাস পরে তাঁকে হঠাৎ কলিকাতায় ফিরিয়ে এনে

লালবাজারে পুলিশ লক-আপে নিয়ে যাওয়া হল—জায়গাটি ছিল যেন একটি নরককুণ্ড। ভোররাত্রে, তখনও অন্ধকার কাটেনি, সুভাষচন্দ্র এবং আরও সাতজন সহ বন্দীদের দুটি প্রিজন ভ্যানে তুলে খুব দ্রুত-গতিতে নদীর তীরে নিয়ে যাওয়া হল। প্রায় তিনঘণ্টা একটি মোটর বোটে নদীর এদিক থেকে ওদিকে ঘুরিয়ে তাঁদের বর্মা-অভিমুখী একটি জাহাজে তুলে দেওয়া হল।

যাত্রার চারদিন পরে রাজবন্দীরা রেঙ্গুনে অবতরণ করলেন। একটি সশস্ত্র বড় পুলিশ দলের পাহারায় পুরো একদিনের ট্রেন যাত্রা করে তাঁদের মান্দালয়-এ নিয়ে যাওয়া হল। মান্দালয় জেলে যাবার সময় সুভাষ খুব গর্বের সঙ্গে স্মরণ করলেন যে লোকমান্য তিলক ঐ জেলে ছ'বছর এবং লালা লাজপত রায় এক বছর কাটিয়েছিলেন। মান্দালয় জেলের ভেতরটা ভারতবর্ষের কারাগার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের ছিল। ছুঁচালো গোঁজের বেড়া দিয়ে জেলখানা তৈরী করা হয়েছিল এবং বন্দীদের মান্দালয়ের তীব্র শীত, প্রচণ্ড গরম এবং গরমকালের ধূলা ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রচণ্ড বর্ষা থেকে বাঁচাবার কিছু ছিল না। জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং অন্য কর্মচারীরা যদিও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁরা বন্দীদের কষ্ট দিতে চাইতেন না, কিন্তু বন্দীদের সম্বন্ধে যাদের আসল দায়িত্ব সেই বাঙ্গলা সরকার ছিল অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ, আর ভারত সরকার ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন।

সুভাষচন্দ্র তাঁর জনসেবার শিক্ষানবীশীর প্রথম পর্যায়ে কাজ করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অধীনে। ভারতবর্ষে তাঁর ভবিষ্যতের কাজের প্রস্তুতির দ্বিতীয় পর্যায়টি কেটেছিল বর্মার কারা-প্রাচীরের ভেতরে। বর্মায় তাঁর কারাগারের সেল থেকে তাঁর এক বন্ধুকে লেখা চিঠিতে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় তাঁর জীবনের এই অধ্যায়ের বর্ণনা দিয়েছিলেন:

"এখনো বিহার কল্পজগতে
জেলখানা (অরণ্য) রাজধানী,
এখনো কেবল নীরব ভাবনা

কর্মবিহীন বিজন সাধনা
দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা
আপন মর্মবাণী।

*      *      *

মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে

*      *      *

গড়িতেছি মন আপনার মনে
যোগ্য হতেছি আপনার কাজে।

*      *      *

কবে প্রাণ খুলি বলিতে পারিব
"পেয়েছি আমার শেষ"!
তোমরা সকলে এস মোর পিছে
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগ রে সকল দেশ!"

অত্যন্ত কঠোর এবং কষ্টকর বন্দীজীবনের মধ্যে সুভাষচন্দ্র প্রগাঢ় এবং গভীর আত্মপরীক্ষা এবং মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করতেন। তাঁর কারাগারের নোটবুকগুলিতে দু-একবার চোখ বোলালেও যে কোন লোক বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারবেন যে তিনি মান্দালয়ের নিঃসঙ্গ জেলে কত বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করেছেন এবং লিখেছেনও। বিষয়-বস্তুগুলির মধ্যে ছিল দর্শন ও ধর্ম, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতসহ শিল্প ও সংস্কৃতি, শিক্ষা, জন-স্বাস্থ্য, কারা সংস্কার, নাগরিক অগ্রগতি ইত্যাদি। তাছাড়া তিনি বর্মার ইতিহাস, রাজনীতি এবং জনগণ সম্বন্ধেও গভীর অনুশীলন করে-ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ কারাবাসের সময় তিনি তাঁর পরিবারের লোকদের বিশেষ করে মেজদাদা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে, বন্ধু ও সহকর্মীদের এবং সরকারের সঙ্গে প্রচুর চিঠিপত্র আদানপ্রদান করেছিলেন। তাঁর চিঠিপত্রে ( নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিতব্য ) তিনি যে কত

বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছেন তার শেষ নেই। সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সহকর্মীদের কাছে লেখা তাঁর চিঠিগুলিতে তিনি কিভাবে প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম চালাতে হবে এবং উন্নতি করতে হবে সে বিষয়ে বিস্তৃত নির্দেশ এবং পরামর্শ দিতেন। সরকারের কাছে লেখা তাঁর চিঠিগুলিতে পরাধীন দেশের রাজনৈতিক বন্দীদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে বিদেশী আমলাতন্ত্রের সঙ্গে তিনি যে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তা প্রকাশিত হয়েছে।

১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সহবন্দীরা জেলে দুর্গাপূজা করার জন্য সুযোগ-সুবিধা এবং অর্থ দাবী করেছিলেন। সরকারের অনুমোদন পাওয়া যাবে এই আশা করে জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট যদিও অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু সরকার অনুমোদন দিতে অস্বীকার করেন। সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সহবন্দীরা তখন ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনশন ধর্মঘট করলেন। তাঁরা পনের দিন অনশন করার পর সরকার নতি স্বীকার করল এবং তাঁদের দাবী মেনে নিল।

১৯২৬ সালের শেষদিকে ব্যবস্থাপক সভাগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হল এবং নতুন নির্বাচনের কথা ঘোষণা করা হল। বাঙ্গলার কংগ্রেস সুভাষচন্দ্রকে উত্তর কলিকাতার একটি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করালেন। বাঙ্গলায় উদারপন্থীদের নেতা তাঁর শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন যিনি আগের নির্বাচনে স্বরাজ্য পার্টির প্রার্থীকে পরাজিত করেছিলেন। এই প্রতিযোগিতা যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। দেশের ঝিমিয়েপড়া রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্র জাতীয়তাবাদের ফিরতি জোয়ারের প্রতীক হয়ে উঠলেন। বিপুল সংখ্যাধিক্যে সুভাষ নির্বাচনে জয়লাভ করলেন। তাঁর কারাবাস অবশ্য চলতে লাগল।

কারাজীবনের দুঃসহ অবস্থা এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে ১৯২৬ সালের অনশন ধর্মঘট যুক্ত হয়ে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটিয়েছিল। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হবার পর তাঁর জ্বর আর ছাড়ছিল না; তাঁর দেহের ওজনও দ্রুত কমে গেল। একটি

মেডিক্যাল বোর্ড দ্বারা তাঁর স্বাস্থ্যের পরীক্ষা করানোর জন্য তাঁকে রেঙ্গুনে নিয়ে যাওয়া হল; মেডিক্যাল বোর্ড সুপারিশ করেছিল যে তাঁকে আর জেলে রাখা উচিত নয়। তাঁকে পরে ইনসিন জেলে স্থানান্তরিত করা হল—সেখান থেকে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সরকারের কাছে একটি জরুরী বার্তা পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু সরকারের তাতে দয়া হল না। সরকার প্রস্তাব করল যে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে যদি তিনি রেঙ্গুন থেকে ইউরোপ-অভিমুখী একটি জাহাজে চড়েন, যে জাহাজ ভারতের মাটি স্পর্শ করবে না। সুভাষ সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বর্মার ইন্‌সপেকটর জেনারেল অব্ প্রিজনস্‌কে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—'আমার জীবনের যথেষ্ট মূল্য দিলেও আমি আরও বেশি ভালবাসি আত্মসম্মানকে, আর আমার জীবনের বিনিময়ে আমি সেই পবিত্র ও অলঙ্ঘ্য অধিকারগুলি, যা হবে ভবিষ্যতের ভারত-রাষ্ট্রের ভিত্তি, বিলিয়ে দেব না।' তারপর সরকার তাঁকে উত্তরপ্রদেশের আলমোড়া জেলে বদলীর আদেশ দিলেন। রেঙ্গুন থেকে তাঁকে একটি জাহাজে তুলে দেওয়া হল, চতুর্থ দিনে জাহাজটি হুগলী নদীর মুখে ডায়মণ্ডহারবারে পৌঁছল। জাহাজটি কলিকাতায় পৌঁছবার আগে তাঁকে বাঙ্গলার গভর্ণরের লঞ্চে স্থানান্তরিত করা হল; ঐ লঞ্চে ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও গভর্ণরের চিকিৎসকসহ একটি মেডিক্যাল বোর্ড তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছিলেন। পরের দিন সকালে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল। এটি হল ১৯২৭ সালের মে মাসে।

## ১১

১৯২৪ সালের অক্টোবর থেকে ১৯২৭ সালের মে মাস পর্যন্ত যে সময়ে সুভাষচন্দ্র বসু বর্মায় বন্দী ছিলেন, ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বেশ ভাঁটা পড়েছিল। সাধারণভাবে একটি মন্দার ভাব ও বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা চলছিল। ১৯২৫ সালের জুন মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের

অকাল মৃত্যু এই পরিস্থিতির অন্যতম প্রধান কারণ। ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছেছিলেন এবং ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি ছিলেন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন নেতা। তাঁর মৃত্যু তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহকর্মী সুভাষচন্দ্রের কাছে কেবল জাতীয় বিপর্যয়ই ছিল না গভীর ব্যক্তিগত শোকের কারণও হয়েছিল। এই ব্যক্তিগত শোক যে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির অন্যতম কারণ, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তিনি দেশবন্ধুর বিধবা পত্নী বাসন্তী দেবী এবং অন্যদের কাছে তাঁর নেতার মৃত্যুর পর যেসব চিঠিপত্র লিখেছিলেন সেগুলি থেকে তাঁর অন্তরের গভীর ক্ষতের কথা জানা যায়। দেশবাসীর এবং বিশেষ করে বাঙ্গলার অভিভাবকহীন ও পরিত্যক্ত যুব সম্প্রদায়ের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তিনি বাসন্তী দেবীকে এগিয়ে এসে বাঙ্গলার জনজীবনে তাঁর স্বামীর স্থানটি অধিকার করার জন্য অনুনয় করেছিলেন।

সক্রিয় রাজনীতি থেকে মহাত্মা গান্ধীর কার্যতঃ অবসর গ্রহণ ১৯২৫-২৭ সালে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক মন্দার আর একটি বড় কারণ। তিনি খাদির প্রচারে এবং অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে গঠনমূলক কাজে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিলেন।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর স্বরাজ্য পার্টিতে ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গন ধরল। দেশবন্ধুর প্রাণবন্ত নেতৃত্ব দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী ও বামপন্থী মতবাদের সভ্যদের পার্টির পতাকাতলে একত্রিত করেছিল। তাঁর অবর্তমানে অনম মতের সভ্যরা নিজ নিজ আদর্শগত প্রবণতা অনুযায়ী ঘাঁটি খুঁজছিলেন।

সুভাষচন্দ্র সম্পূর্ণ ভগ্নস্বাস্থ্যে বর্মা থেকে ফিরে এলেন। তাঁর প্রথম কাজ ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুস্থ হয়ে উঠে জনজীবনে সক্রিয়ভাবে প্রবেশ করা। ১৯২৭ সালের শেষার্ধে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তিনি পরিবারের অনেকের সঙ্গে শিলংয়ে কয়েকমাস ছিলেন। যদিও তিনি লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন, তাঁর প্রধান চিন্তা ছিল কংগ্রেস পার্টির ভবিষ্যৎ এবং সর্বভারতীয় ভিত্তিতে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর মহাত্মা

গান্ধী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু পার্টি ছিল সাংঘাতিক দ্বন্দ্বে জর্জরিত। সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। শ্রমিক অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ছিল এবং নতুন নতুন শক্তি নতুন মত নিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করছিল। ১৯২৭ সালের শেষদিকে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

সাধারণভাবে ভগ্নোদ্যম পরিস্থিতির মধ্যে ইংরেজ সরকারের একটি কাজ ঠিক এই সময়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নতুন ভাবে ঠেলে তুলে দিল। বড়লাট লর্ড আরউইন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংস্কার সুপারিশ করার জন্য স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে কেবল ইংরাজ সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করলেন। ব্রিটেনে টোরীরা তখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। লেবার পার্টির সরকার ক্ষমতায় আসার আগে তারা ভারতের প্রশ্নটির একটি সমাধান করে ফেলতে চেয়েছিল। সাইমন কমিশন নিয়োগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে তীব্র প্রতিক্রিয়া হল। ভারতবর্ষের জনগণ তাঁদের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ নির্ণয় করার অধিকার ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে দিতে প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং কংগ্রেস সময় নষ্ট না করে এবং কোনরকম দ্বিধা না করে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই সাইমন কমিশন বয়কট করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল।

১৯২৬ সালে যথেষ্ট আন্তঃ-সাম্প্রদায়িক চাপা উত্তেজনা ও বিরোধ ছিল। এবার কিন্তু প্রবণতা ভালর দিকেই চালিত হল। নভেম্বরে একটি ঐক্য সম্মেলন হল; তারপরেই কলিকাতায় অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের একটি অধিবেশন এবং ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে মাদ্রাজে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হল। সাইমন কমিশনকে 'প্রতিটি স্তরে এবং সর্বপ্রকারে' বয়কট করে মাদ্রাজ কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা করার জন্য একটি সর্ব-দলীয় সম্মেলন আহ্বান করার প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল। তার ওপর কংগ্রেস সঠিকভাবে স্থির করেছিল যে পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতাই ভারতের জনগণের

লক্ষ্য। ভারতবর্ষের নতুন যুব আন্দোলন এই সময় থেকে সুরু করে কংগ্রেসের নীতির ওপর সুনির্দিষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে। কংগ্রেস উদীয়মান বামপন্থীদের প্রতিনিধিদের ওয়ার্কিং কমিটিতে নিয়োগ করল এবং জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু ও সোয়েব কোরেশিকে সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করে সংগঠনের নতুন রূপান্তর ঘটাল।

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সাইমন কমিশন যখন ভারতে পৌঁছল, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশে সর্ব-ভারতীয় হরতাল হয়েছিল। বাঙ্গলায় সুভাষের নেতৃত্বে কংগ্রেস আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বিলিতি জিনিষ বয়কট করার জন্য জোরালো অভিযান চালিয়েছিল। মে মাসে সবরমতীতে সুভাষ মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে অবসরগ্রহণ ত্যাগ করে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে এবং যতদূর সম্ভব ব্যাপক আকারে দেশকে সংগ্রামের পথে নিয়ে যেতে অনুনয় বিনয় করেছিলেন।

জনগণের বিরোধিতার মুখে সাইমন কমিশন দেশে ঘুরছিলেন, সেই সময় ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে এবং আবার মে মাসে সর্বদলীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল এবং তাতে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে সভাপতি করে এবং সুভাষকে নিয়ে একটি ছোট কমিটি গঠিত হয়েছিল। সংবিধানের মৌলিক বিষয়ে বিভিন্ন মত ছিল—সুভাষচন্দ্র সহ সংখ্যালঘু দল স্বায়ত্তশাসনের বদলে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেছিলেন। নেহরু কমিটি যখন সংবিধানের মূলতত্ত্বগুলি আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসার কাজে ব্যস্ত, সুভাষ তখন দেশের চারিদিকে ঘুরতে বেরিয়ে পুণায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন। সেখানে একটি রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে তিনি কংগ্রেসের রাজনৈতিক সংগঠন, কর্মসূচী ও পরিকল্পনা বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মতামত প্রচারের কাজে এগিয়ে গেলেন। কংগ্রেসের প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলা এবং নারী, যুবক ও ছাত্রদের তাঁদের নিজেদের স্বার্থে এবং সমগ্র দেশের স্বার্থে নিজ নিজ সংগঠন গড়ে তোলা উচিত—তিনি এই মতের দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছিলেন।

নেহরু কমিটি সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসায় আংশিক সাফল্য লাভ করেছিল। কিন্তু স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে এদের সুপারিশ জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র ও অন্য তরুণ বাম জাতীয়তাবাদীদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। জাতীয় ঐক্যের শক্তি যাতে দুর্বল হয়ে না পড়ে, সেজন্য তাঁরা স্থির করলেন যে জাতীয় ফোরামকে খোলাখুলিভাবে ভাগ না করে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে অভিযান চালাবার জন্য তাঁদের নিজেদের ফোরাম গড়ে তুলবেন। সেই অনুযায়ী ১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লীতে জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর যুক্ত নেতৃত্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে শাখাসহ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অব্ ইণ্ডিয়া লীগ-এর উদ্বোধন করা হল। তাঁরা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পদেও রইলেন।

জাতীয় জীবনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র—ছাত্র আন্দোলনে ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ-এর উদ্দেশ্য প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনে সারা বাঙ্গলার এবং বিশেষ করে কলিকাতার ছাত্ররা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং এই সংগ্রামে যথেষ্ট কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছিল। ছাত্রদের অধিকার রক্ষা করতে এবং সংগ্রাম করার জন্য তাই তাঁদের নিজেদের একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করা গিয়েছিল। সুভাষ এবং জওহরলাল উভয়েই এই সম্প্রসারণকে সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। ১৯২৮ সালের আগষ্ট মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস্ কনফারেন্সে জওহরলাল সভাপতিত্ব করেছিলেন। তারপর সারা বাঙ্গলায় এবং ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও ছাত্রদের অনেক সংগঠন গড়ে উঠেছিল।

বছরটি এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ব্যারোমিটারও উঠতে থাকল এবং তা শ্রমিকদের জগতেও প্রভাব বিস্তার করল। আগের বছরে কলিকাতার কাছে খড়্গপুরে ইতিমধ্যে রেলওয়ে কর্মীদের ধর্মঘট হয়েছিল। ১৯২৮ সালে জামসেদপুরে টাটা ষ্টীল ওয়ার্কসে ধর্মঘট হল। সুভাষচন্দ্র শ্রমিকদের পক্ষে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন এবং এই ধর্মঘট তাঁকে শ্রমিক আন্দোলনে নিয়ে এল। এর

পর বোম্বাই-এর বস্ত্রশিল্পে, কলিকাতার কাছে লিলুয়ায় রেলকর্মীদের এবং আরও কয়েকটি জায়গায় ব্যাপক আকারে ধর্মঘট হয়।

যুব সংগঠনও সমানভাবে সুভাষকে ব্যস্ত রেখেছিল। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় অল ইণ্ডিয়া ইয়ুথ কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হল—এর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন সুভাষ এবং পৌরোহিত্য করেন বোম্বাই-এর কে. এফ. নরীম্যান। ছাত্র ও যুবকদের প্রতি অভিভাষণ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র কর্মবিমুখতা ও প্রাচীনপন্থার বিরুদ্ধে এবং সংগ্রামী জীবনদর্শন ও আধুনিকতার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের স্বপ্নের নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার জন্য তিনি আধুনিক চিন্তাধারা ও আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য বার বার বলেছিলেন।

## ১২

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ১৯২৮ সালের বার্ষিক অধিবেশন পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হল। সুরু থেকে কংগ্রেসের যতগুলি অধিবেশন হয়েছে তার মধ্যে কলিকাতারটিই ছিল সবচেয়ে বড় এবং সব ব্যবস্থাপনাও হয়েছিল বিরাট আকারে। সুভাষচন্দ্র বসু এই অধিবেশনে ছিলেন যুব ও বাম শক্তিগুলির প্রধান মুখপাত্র। তিনি কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং (জি. ও. সি) হয়েছিলেন—এই বাহিনী তিনিই গড়ে তুলেছিলেন এবং আধা-সামরিক কায়দায় এদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে এই বাহিনীকে সামরিক নিয়মশৃঙ্খলায় সংগঠিত করেছিলেন। এই বাহিনীতে মোটর সাইকেল ইউনিট, অশ্বারোহী ইউনিট এবং নারী বাহিনী প্রভৃতি বিভিন্ন ইউনিট ছিল। সকলেই আধা-সামরিক ইউনিফর্ম পরতেন। জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং যখন পুরো সামরিক পোষাকে স্বেচ্ছাসেবকদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করতেন, সে দৃশ্য হত অপূর্ব। সুভাষচন্দ্র এইভাবে জাতীয় আন্দোলনে একটি নতুন ধারার

সূচনা করলেন—দেশকর্মীদের মধ্যে সামরিক শৃঙ্খলার প্রবর্তন। ১৯২৮ সালে যা ছিল শুধু স্বপ্ন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে তা-ই বাস্তব রূপ নিয়েছিল।

কংগ্রেস অধিবেশনে মূল রাজনৈতিক প্রস্তাবটি নিয়ে প্রবীণদের এবং তরুণ নেতাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হল। খোলা অধিবেশনে স্বায়ত্তশাসন দাবী করে এবং সেই দাবী পূরণে ইংরাজকে বার মাস সময় দিতে চেয়ে গান্ধীজীর প্রস্তাবের ওপর সুভাষচন্দ্র বসু একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনে বলেছিলেন যে পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। সংশোধনটির সমর্থনে সুভাষ বলেছিলেন যে আগের বছর মাদ্রাজ কংগ্রেসে স্বাধীনতার পতাকাকে তুলে ধরা হয়েছিল, বর্তমানের মূল প্রস্তাবটিতে তাকে নামিয়ে আনা হয়েছে। তাছাড়া আমাদের দেশবাসীর এবং বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মধ্যে নতুন একটি মানসিকতা ও নতুন সচেতনতা জাগিয়ে তোলার জন্য পূর্ণ স্বরাজ সম্বন্ধে একটি ঘোষণার প্রয়োজন। তিনি আরও বলেছিলেন যে পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই তিনি এই প্রস্তাব আনছেন, কারণ তরুণ নেতাদের নতুন প্রজনন, তিনি যাঁদের প্রতিনিধি, স্বাধীনতার প্রশ্নে কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত। তিনি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথাও উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে মাদ্রাজে গৃহীত প্রস্তাব আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতবর্ষকে যে নতুন মর্যাদা দিয়েছে, তা হারাতে প্রস্তুত নন। দ্বিতীয়তঃ, ইয়োরোপ ও এশিয়ার রাজনীতি এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা দেখে মনে হচ্ছে যে বিশ্বব্যাপী একটি মহাযুদ্ধের সূচনা হতে যাচ্ছে। এই সার্বিক পরিস্থিতিতে আশু এবং পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য ভারতবর্ষকে সাহসের সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী প্রস্তাব ৯৭৩-১৩৫০ ভোটে পরাজিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের মতে কলিকাতা কংগ্রেসের নরমপন্থী প্রস্তাব মূল্যবান সময় নষ্ট করেছিল এবং জনগণকে এগিয়ে যাবার আহ্বান থেকে বঞ্চিত করে হতাশাগ্রস্ত করেছিল। তবে সুভাষ মনে করেছিলেন যে কংগ্রেসে বাম গোষ্ঠী যে যথেষ্ট শক্তি

অর্জন করেছে, অন্ধকারে এইটিই একমাত্র আশার আলো।

কলিকাতা কংগ্রেসের পরে মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করেছিলেন যে ইংরাজ সরকার যদি ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দিতে স্বীকৃত না হন, তাহলে ১৯৩০ এর ১লা জানুয়ারী তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার প্রবক্তা হয়ে যাবেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি সময় নিচ্ছেন এবং সামনের সংগ্রামের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন। অন্যদিকে, ১৯২৯ সালে তিনটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যা জনগণের মনোবল রক্ষায় সহায়ক হয়েছিল। এগুলির মধ্যে প্রথম হল উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের প্রকাশ—১৯২৮ সালে লালা লাজপত রায়ের ওপর আক্রমণের জন্য দায়ী ইংরাজ পুলিশ অফিসারকে হত্যা এবং দিল্লীর এসেমব্লী চেম্বারের ভেতরে ভগত সিং ও বটুকেশ্বর দত্তর বোমা নিক্ষেপ। এই সব ঘটনার পরে সরকার তথাকথিত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা সুরু করল; তাতে যে শুধু জনগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হল তাই নয়, সারা ভারতের বিপ্লবী দেশপ্রেমিকদের জন্য সহানুভূতিও সৃষ্টি হল। 'নওজওয়ান ভারত সভা' নামে পাঞ্জাবে যুব আন্দোলনের একটি সংস্থার নেতা ছিলেন সর্দার ভগত সিং; সুভাষচন্দ্র পরবর্তী পর্যায়ে নিজেকে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেছিলেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন এক বাঙ্গালী যুবক যতীন্দ্রনাথ দাশ—সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কলিকাতার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর তিনি ছিলেন একজন মেজর। বিপ্লবী বন্দীদের বিচারাধীন রাজনৈতিকবন্দী হিসাবে গণ্য করার দাবীতে যতীন্দ্রনাথ আমরণ অনশন সুরু করেছিলেন। সরকার এই দাবী পূরণ করতে অস্বীকার করায় তিনি শেষদিন পর্যন্ত অনশন চালিয়ে ১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর কারাগারেই মৃত্যু বরণ করেন। যতীন দাশের আত্মত্যাগে সুভাষচন্দ্র গভীরভাবে বিচলিত হয়েছিলেন এবং তাঁর শেষকৃত্যের দায়িত্ব নিজেই নিয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথের এই আত্মবলিদান ভারতবর্ষের যুবকদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং ছাত্র ও

যুব সংগঠনগুলির বিকাশে আরও বেশী উৎসাহিত করেছিল। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় এবং অন্যান্য প্রদেশেও পরপর কয়েকটি ছাত্র ও যুবকদের সম্মেলন। এই সম্মেলনগুলির অধিকাংশই সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যথা, পাঞ্জাব ছাত্র সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন, মধ্যপ্রদেশ যুব সম্মেলন এবং বিহার ছাত্র সম্মেলন। এই সব সম্মেলনে অন্যান্য যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন জওহরলাল নেহরু, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডু এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। ছাত্র ও যুবকদের সম্বোধন করে বিভিন্ন ভাষণে সুভাষচন্দ্র দেশপ্রেম, সংহতি, স্বার্থত্যাগ, সাহস এবং পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আপোষহীনভাবে সংগ্রাম করে যাবার ওপর জোর দিতেন। তিনি তাঁর যুবশ্রোতাদের বলতেন যে জনমত গঠনের দায়িত্ব তাদের অবশ্যই নিতে হবে, কারণ ভারতবর্ষের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান করতে হবে তাদেরই, আর সেই জন্যই সমসাময়িকদের চেয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সুদূরপ্রসারী হওয়া চাই। ১৯২৯ সালে ভারতীয় রাজনীতিতে তৃতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান অশান্তি যা আগের বছর থেকেই সুরু হয়েছিল। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে তিনজন ইংরাজসহ একদল ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত মামলায় তাদের বিচারের জন্য পাঠান হল। ডিফেন্স কমিটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সুভাষচন্দ্র বন্দীদের পক্ষ সমর্থনে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের মতে ১৯২৯ সালে ভারতবর্ষে অন্যান্য সম্ভাবনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে একটি রাজনৈতিক অভিযান সুরু করা উচিত ছিল। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কংগ্রেস বার বার মন্ত্রীদের সরিয়ে দিতে সক্ষম হওয়ায় বাঙ্গলায় কংগ্রেসের অবস্থা খুবই অনুকূল ছিল। লাটসাহেব যখন কাউন্সিল ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচনের আদেশ দিলেন, কংগ্রেস আরও বেশী শক্তিলাভ করে জয়ী হল। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও কংগ্রেস দলে সুভাষ ও তাঁর সহকর্মীদের

উল্লেখযোগ্য সংগঠন ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। সরকারের ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মানহানির জন্য আদালত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র 'ফরওয়ার্ড'কে এত বেশী অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল যে পরিচালক গোষ্ঠী পত্রিকাটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক পরের দিনই 'লিবার্টি' নামে নতুন একটি সংবাদপত্র জন্মলাভ করেছিল। ফলে কংগ্রেস দল তাদের মুখ্য প্রচার মাধ্যম থেকে বঞ্চিত হয়নি।

১৯২৯ সালের শেষার্ধে মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে কংগ্রেসীদের ব্যবস্থাপক সভাগুলি থেকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু যদিও মাস দুই আগে বাঙ্গলা কংগ্রেসকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে উৎসাহিত করেছিলেন, তিনি এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং সুভাষচন্দ্র বিরোধিতা করায় প্রস্তাবটি বাতিল করা হল এবং বিষয়টি ডিসেম্বর মাসে লাহোর কংগ্রেস পর্যন্ত মুলতুবী রাখা হল।

লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি বাছাই করার সময়ে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলির অধিকাংশ সদস্য গান্ধীজীকে মনোনীত করেছিলেন ; কিন্তু জওহরলালের পক্ষে মহাত্মা সরে দাঁড়ান।

১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে শ্রমিকদলের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের অনুরোধক্রমে বড়লাট লর্ড আরউইন ঘোষণা করলেন যে ভারতবর্ষের সাংবিধানিক অগ্রগতির স্বাভাবিক বিচার্য বিষয়টি হল পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অধিকার অর্জন এবং সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর লণ্ডনে একটি গোলটেবিল বৈঠক বসবে। নভেম্বর মাসে সব দলের নেতাদের একটি সম্মেলনে ভারতবর্ষের জন্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের সংবিধান উদ্ভাবনের জন্য ইংরাজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রস্তাব করে বিপুল সংখ্যাধিক্যের মতে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়। এই বিবৃতিতে যাঁরা স্বাক্ষর করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, পণ্ডিত জওহরলাল

নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ভি. এস. শাস্ত্রী, তেজ বাহাদুর সপ্রু প্রমুখেরা। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন মেনে নেওয়া এবং তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের বিরোধিতা করে সুভাষচন্দ্র বসু সৈফুদ্দিন কিচলু এবং আবদুল বারির সঙ্গে যুক্ত ভাবে আলাদা একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা দাবী করেছিলেন যে সত্যিকার একটি গোলটেবিল বৈঠকে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করবেন ভারতীয় জনগণ, ইংরাজ সরকার নয়। তাঁরা জনগণকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে ইংরাজদের প্রস্তাব একটি ফাঁদ এবং তা আয়ার্ল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে একই ধরণের প্রস্তাবের কথা মনে করিয়ে দেয়, সিন্ ফিন্ দল যে প্রস্তাবের স্বরূপ বুঝতে পেরে যথার্থভাবেই তা প্রত্যাখ্যান করেছিল।

ডিসেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত মতিলাল ইংরাজ বড়লাটের সঙ্গে দেখা করলেন এবং ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসন অধিকার দেওয়া হবে এই প্রতিশ্রুতি চাইলেন, কিন্তু তা পাওয়া যায়নি। তাঁরা নিরাশ হয়ে ফিরলেন এবং শূন্য হাতে লাহোর কংগ্রেসে গেলেন।

## ১৩

১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ঐতিহাসিক লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশন হল। পূর্ণ স্বাধীনতার জাতীয় দাবীর প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে মহাত্মা গান্ধী নিজেই এগিয়ে এলেন। ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ঠিক মধ্যরাত্রে রাভি নদীর তীরে বিশাল জনতার উপস্থিতিতে তরুণ তেজী কংগ্রেস সভাপতি স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দিলেন। এই ঘটনাটি ভারতের জনগণের কাছে এক বিশেষ অনুপ্রেরণা এবং এক নতুন বাণী বহন করে এনেছিল।

কলিকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসু যে প্রস্তাবনা রেখেছিলেন তার থেকে তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি জোর দিয়ে

বললেন যে জাতীয় দাবী দুর্বার করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা হোক। তিনি প্রস্তাব করলেন যে দেশে একটি সমান্তরাল সরকার গঠন কংগ্রেসের লক্ষ্য হোক এবং তা করার জন্য শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের সংগঠিত করার কাজ সুরু করা হোক। তাঁর মতে কেবল কংগ্রেসীদের ব্যবস্থাপক সভাগুলি থেকে পদত্যাগ করতে বলে একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণই যথেষ্ট নয়। বামপন্থীরা আর একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন যে গান্ধীজীর সামাজিক গঠনমূলক কার্যসূচী তাঁর প্রস্তাবিত স্বশাসিত সংস্থার হাতে না দিয়ে কংগ্রেসী ও কংগ্রেস সংগঠনের হাতে থাকা উচিত। দুটি প্রস্তাবের কোনটিই গৃহীত হয় নি।

লাহোর কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন—'আমার কার্যসূচী হল সর্বাত্মক বয়কটের······আপনারা যদি সর্বাত্মক বয়কটের জন্য প্রস্তুত না হন, তাহলে শুধু ব্যবস্থাপক সভাগুলি বয়কট করলে কোন কাজ হবে না।' 'আমি একজন চরমপন্থী এবং আমার নীতি হল—সব কিছু চাই অথবা কিছুই নেব না।' 'গোলটেবিল বৈঠক হল দুটি যুধ্যমান দলের মধ্যে এবং দুই বিপক্ষদলের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি বৈঠক। আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি —ইংরাজ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাবার জন্য পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন প্রতিনিধি পাঠাবার জন্য ভারতবাসীদের কি আমন্ত্রণ জানান হয়েছে ?'

'আমি বলছি যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শ্রমিক, কৃষক এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের সংগঠিত করতে না পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আইন-অমান্য আন্দোলন সফল হবে না।'

লাহোর কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসু সহ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং বাম গোষ্ঠীর আরও কয়েকজনকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী চেয়েছিলেন যে কংগ্রেস দলের সর্বোচ্চ পরিষদ হবে একই গোষ্ঠীর লোকদের নিয়ে, যাতে তিনি হাই কম্যাণ্ডের ভিতর থেকে বিনা বাধায় নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ

করে যেতে পারেন।

১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে বাঙ্গলা কংগ্রেসে ভাঙ্গন দেখা দিল যখন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত গান্ধীজীর নীতিকে পূর্ণ সমর্থন জানালেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্র তা করতে অস্বীকার করে গান্ধীজীর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিপক্ষে এবং পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন। লাহোর কংগ্রেসের একমাস আগে যখন বাঙ্গলা কংগ্রেস কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখন থেকেই বিরোধ বেশ বেড়ে গিয়েছিল। নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর বসু গোষ্ঠী জয়লাভ করেছিল। রাজনৈতিক ধারা ও কর্মসূচী ভিত্তি করে এর ফলে দলে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব চলেছিল। যাই হোক, মোটামুটিভাবে বাঙ্গলা কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্য আদর্শবাদী বিপ্লবপন্থীদের পাশাপাশি সুভাষচন্দ্রকে তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে সমর্থন করেছিল।

১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসের গোড়ায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করল যে ২৬শে জানুয়ারী সারা দেশে স্বাধীনতা দিবস হিসাবে উদযাপন করতে হবে। কমিটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ওপর একটি ঘোষণাপত্রও শপথ বাক্যে আকারে একটি ইস্তাহারও প্রকাশ করেছিল। অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সঙ্গে সমগ্র জাতি প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করল। মহাত্মা গান্ধী তাঁর অভিযান সুরু করার আগে একদিকে মধ্যপন্থীদের এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে তিনি যাকে 'স্বাধীনতার সারাংশ' বলেন তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন, অন্যদিকে বামপন্থীদের আশ্বাস দিলেন যে এবার আইন অমান্য একবার সুরু হলে একজনও আইনঅমান্যকারী জীবিত বা ছাড়া থাকা পর্যন্ত তা থামান যাবে না।

সুভাষচন্দ্র তাঁর সংগ্রামশীল কার্যসূচী রূপায়ণ করার জন্য কংগ্রেস ডিমোক্রাটিক পার্টি গঠন করলেন। কিন্তু লাহোর থেকে কলিকাতায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে এবং তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করার আগেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল এবং একবছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। খাঁচায় আবদ্ধ বাঘের মত তিনি গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশে

ঝঞ্ঝা-বহুল যে সব ঘটনা ঘটতে লাগল সেগুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগলেন।

মার্চ মাসের গোড়ার দিকে মহাত্মাজী একদল বাছাইকরা অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে লবণ আইন ভঙ্গ করবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করে ইংরাজ বড়লাট লর্ড আরউইনকে তাঁর ঐতিহাসিক নোটিশ দিলেন। সুভাষ তাঁর 'দি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল্' বইটিতে লিখেছেন যে গান্ধীজীর পরবর্তী পদক্ষেপগুলি তাঁর নেতৃত্বের বিরাটতম কীর্তি বলে সর্বকালে স্বীকৃত হবে এবং সংকটের সময় তাঁর কূটনৈতিক বুদ্ধি কত প্রখর হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ দেয়। গান্ধীজীর চিঠির একটি সংক্ষিপ্ত উত্তরে বড়লাট জানিয়েছিলেন যে তাঁর আইন ভঙ্গ করার ইচ্ছার কথা জেনে তিনি দুঃখিত। তারপর মহাত্মাজী সুরু করলেন আমেদাবাদ থেকে সমুদ্র উপকূলবর্তী গ্রাম ডাণ্ডি পর্যন্ত তাঁর তিন-সপ্তাহের ঐতিহাসিক পদযাত্রা—সেখানেই আইন অমান্য সুরু হবার কথা। গান্ধীজী যে সব এলাকা দিয়ে গিয়েছিলেন কেবল সেই সব অঞ্চলকেই যে এই পদযাত্রা জাগিয়ে তুলেছিল তাই নয়, সারা দেশকে এই যাত্রা দেশপ্রেম এবং সংকল্পের এক নতুন জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

৬ই এপ্রিল গান্ধীজী সমুদ্রতীরে পড়ে থাকা লবণের কয়েকটি টুকরো তুলে নিয়ে এই অভিযান সুরু করলেন। একই সঙ্গে সারা দেশে অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধের ঢেউ বয়ে গেল। আইন অমান্যের সঙ্গে সুরু হল ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জন, রাজদ্রোহ আইন অমান্য, মদের দোকানে পিকেটিং ইত্যাদি। মহাত্মা গান্ধীর বিশেষ আবেদনে সাড়া দিয়ে মেয়েরা হাজারে হাজারে এই অভিযানে যোগদান করল এবং তাদের উদ্দীপনা পুরুষদের আরও বেশি স্বার্থত্যাগে ও কর্মে উৎসাহিত করল। এপ্রিল মাসের শেষাশেষি ইংরাজ সরকার সারা ভারতবর্ষে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালু করল, অর্ডিনান্সের পর অর্ডিনান্স জারী করতে লাগল এবং কংগ্রেসকে বেআইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করল। হাজার হাজার বন্দীদের রাখার জন্য বিশেষ

কারাগার তৈরী হল। অনেক প্রদেশে কর বন্ধ আরম্ভ হল। শত শত লোককে গুলি করে মারা হল।

দেশে যখন এক বিরাট বিদ্রোহ চলছে, সেই সময়েই এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে একটি চাঞ্চল্যকর বিপ্লবাত্মক ঘটনা ঘটল। মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করে একদল যুবক সূর্য সেনের নেতৃত্বে অস্ত্রাগার আক্রমণ করল এবং অস্ত্রশস্ত্রগুলি নিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিল। তারা বেশ কিছুদিন গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিল এবং ঐ অঞ্চলে ইংরাজ শাসন ছিল না বললেই চলে। ওই যুবকদের অধিকাংশই সংগ্রামে নিহত হন এবং বাকীরা আত্মগোপন করেন। ইংরাজ সৈন্য সারা বাংলায় উন্মত্ত নির্যাতন চালাতে থাকে। এই ঘটনা গান্ধীজীর আন্দোলনের সমধারার না হলেও সমগ্র দেশকে কাঁপিয়ে দিল এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধং দেহি মনোভাব নিয়ে মুখোমুখি হওয়ার এবং সক্রিয় প্রতিরোধের একটি নতুন বার্তা বয়ে আনল। আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এই ঘটনা দেশপ্রেমের, বীরত্বের ও আত্মবলিদানের অমর সাক্ষী হয়ে আছে।

৫ই মে মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠান হল। জেলের ভেতর থেকে সুভাষচন্দ্র খুব আনন্দের সঙ্গে আন্দোলনের অগ্রগতির প্রতি লক্ষ্য রাখছিলেন। কলিকাতায় জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি ঘটনায় সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং তাঁদের সহ-বন্দীদের উপর এমন নিদারুণভাবে লাঠিচার্জ করা হল যে তাঁদের মধ্যে অনেকেই গুরুতর আহত হয়েছিলেন এবং অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

১৯৩০ সালের জুন মাসে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হল। রিপোর্টটি এতই অসন্তোষজনক হয়েছিল যে ভারতবর্ষের সব রাজনৈতিক দলই সেটিকে প্রত্যাখ্যান করল। পরবর্তী কয়েকমাস নরমপন্থীদের মাধ্যমে কংগ্রেস ও ইংরাজদের মধ্যে মীমাংসার জন্য চেষ্টা চালান হয়েছিল ; কিন্তু সেই প্রচেষ্টা বিফল হল।

জেলে থাকাকালীনই সুভাষচন্দ্র কলিকাতার মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন ; কিন্তু তিনি ঐ বছরের শেষের দিকে মুক্তিলাভের

পরই কার্যভার গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। মেয়রের অভিভাষণে সুভাষচন্দ্র নাগরিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশবন্ধুর নেতৃত্বের কথা মর্মস্পর্শীভাবে উল্লেখ করেছিলেন। ৯২৪ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ছ'বছর সময়ে স্বরাজ্যদলের কংগ্রেসসেবীরা কর্পোরেশনে ক্ষমতায় ছিলেন—সেই সময় কলিকাতার নাগরিক জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী সুরু করে সেগুলি রূপায়িত করা হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র এই উন্নতির আরও পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন।

১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারী দ্বিতীয় স্বাধীনতা দিবসে সুভাষচন্দ্র বসু কলিকাতার মেয়ররূপে উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে এবং পেছনে একটি বিরাট শোভাযাত্রা সহ পুলিসের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পৌরসভার সদর দপ্তর থেকে ময়দানের দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁরা এসপ্লানেড পার হবার পরই অশ্বারোহী পুলিশের এক বিরাট বাহিনী নির্দয়ভাবে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুভাষচন্দ্র গুরুতরভাবে আহত হলেন এবং তাঁকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁর মোট এগারবার কারাবাসের এই পর্যায় এইরকম নির্দয় ভাবে সুরু হল। পরের দিন একটি জনসভায় সুভাষচন্দ্রের রক্তে ভেজা কাপড়চোপড়গুলি দেখান হয়েছিল।

## ১৪

১৯৩০ সালের শেষদিকে কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই লণ্ডনে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। বৈঠকের শেষে ভারতবর্ষকে দুটো তেতো বড়ি উপহার দেওয়া হল—প্রথম, সংরক্ষণব্যবস্থা ও দ্বিতীয়, যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা। কিন্তু এটা পরিষ্কার হল না যে সব রক্ষাকবচ দেওয়া হলেও একটি সত্যিকারের দায়িত্বশীল সরকার গঠিত হবে কিনা ? আসল ঘটনা হল যে ভারতীয় কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে বোঝাপড়ার বিষয়ে কোন অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে যখন শ্রমিক দলের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে

ম্যাকডোনাল্ড লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক গুটিয়ে ফেলছিলেন, বড়লাট লর্ড আরউইন কংগ্রেসের কাছে সহযোগিতার জন্য একটি প্রকাশ্য আবেদন করলেন। তার অল্পদিনের মধ্যেই মহাত্মা গান্ধী এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তি দেওয়া হল। ভারতীয় উদারপন্থী এবং গান্ধীজীর মধ্যে কয়েকটি আলোচনা সভা হল। অবশেষে গান্ধীজী ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি দিল্লীতে বড়লাটের সঙ্গে দেখা করলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর মার্চ মাসের মাঝামাঝি গান্ধী-আরউইন চুক্তির খসড়া করে জওহরলালের সভাপতিত্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে উপস্থাপিত করা হল এবং তা অনুমোদিত হল। সুভাষচন্দ্র তখন কলিকাতায় জেলে। তাঁর বিচারে ও মতে চুক্তির শর্তগুলি ছিল বিশেষ হতাশাব্যঞ্জক। সব প্রদেশগুলির মধ্যে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী ছাড়া বাঙ্গলাই এই চুক্তির সবচেয়ে বিরোধী ছিল।

মার্চ মাসের গোড়ায় সুভাষচন্দ্র মুক্তি লাভ করেন। এই চুক্তি সম্বন্ধে তিনি বাঙ্গলায় তাঁর সহবন্দীদের সঙ্গে একমত হলেও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে খোলাখুলি এবং পুরো আলোচনা না করে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন না স্থির করলেন। সুতরাং তিনি বোম্বাই গিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করলেন। মহাত্মা সুভাষচন্দ্রকে কতকগুলি নিশ্চিত আশ্বাস দিলেন। তিনি তাঁকে বলেছিলেন যে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যোগদানকারীদের প্রতি নির্দেশে এমন কিছু থাকবে না যা স্বাধীনতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং যেসব রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির বিষয় চুক্তির মধ্যে রাখা হয়নি তাঁদের মুক্তির জন্য তিনি যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন। বোম্বাই থেকে সুভাষচন্দ্র মহাত্মাজীর সঙ্গে দিল্লী পর্যন্ত যাত্রার সময় আলোচনা চালিয়ে গিয়েছিলেন। সারা পথে গান্ধীজী যে সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন, তা দেখে সুভাষ গভীরভাবে অভিভূত হয়েছিলেন এবং জনগণের মধ্যে গান্ধীজীর যে কত প্রভাব ছিল এ থেকেই তা বোঝা গিয়েছিল। দিল্লীতে পৌঁছেই তাঁরা আকস্মিক ও বিস্ময়কর খবর শুনলেন যে সরকার ভগত সিং, শুকদেব

ও রাজগুরুকে ফাঁসি দেবে স্থির করেছে। জনসাধারণের একটি আবেদনে সাড়া দিয়ে এবং গান্ধীজীর হস্তক্ষেপে বড়লাট কয়েক-দিনের জন্য ফাঁসি স্থগিত রাখতে রাজী হয়েছিলেন। আশা করা গিয়েছিল যে এই স্থগিত রাখায় মৃত্যুদণ্ড শেষ পর্যন্ত নাকচ হবে। মার্চ মাসের শেষে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের জন্য সারা ভারতবর্ষ থেকে প্রতিনিধিরা যখন করাচী অভিমুখী, সেই সময় হঠাৎ সারা দেশে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে ভগত সিং ও তাঁর সাথীদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। প্রগাঢ় দুঃখ এবং নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা সমগ্র জাতিকে অভিভূত করে ফেলল।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সভাপতিত্বে করাচী কংগ্রেসের অধিবেশন হল। বামপন্থীরা, সুভাষ যাঁদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম, স্থির করলেন যে পরিস্থিতির বস্তুগত বিচার বিবেচনা করে তারপর গান্ধী-আরউইন চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব একটি নীতি নির্ধারণ করবেন। অবশেষে তাঁরা ঘোষণা করলেন যে তাঁরা যদিও ঐ চুক্তি অনুমোদন করেন না, তাহলেও ঐ সঙ্কট মুহূর্তে তাঁরা দলকে বিভক্ত করবেন না। বিষয় নির্বাচনী সভায় সুভাষচন্দ্র এই মর্মে একটি বিবৃতি দিলেন। বোম্বাইতে সুভাষচন্দ্রকে গান্ধীজী যে আশ্বাস দিয়েছিলেন গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের সেই অনুযায়ী নির্দেশই দেওয়া হয়েছিল। দলের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক লক্ষ্যের কথা বিবৃত করে মৌলিক অধিকারের ওপর করাচীতে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় সুভাষচন্দ্র তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। লাহোরে এবং করাচীতেও সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর মত যাঁরা বামপন্থী ছিলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে তাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছিল।

করাচীতে কংগ্রেস অধিবেশনের পাশাপাশি ভগত সিং প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত নওজয়ান ভারত সভার অধিবেশন হল সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে। সুভাষচন্দ্র তাঁর অভিভাষণে গান্ধী-আরউইন চুক্তির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং ঐ চুক্তির নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে তাঁর স্বাধীনতার প্রস্তাব নিয়ে প্রথম ধাক্কা দেন এবং সেই থেকে তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছাত্র, যুব ও রাজনৈতিক সম্মেলনগুলিতে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতাগুলির মাধ্যমে প্রচার করছিলেন যে আমাদের উপনিবেশ-বাদ বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যে সংগ্রাম, তার অন্তিম লক্ষ্য ভারতীয় চিন্তাধারার ও ভাবধারার ভিত্তিতে সমাজ তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

নওজওয়ান ভারত সভার করাচী অধিবেশনে শেষ উদ্দেশ্য কি এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় কি সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাষায় তিনি বুঝিয়ে বলেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে ভবিষ্যতের সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো, 'উন্নত মানুষ গড়া, চরিত্র গঠন এবং সমগ্র মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলিকে রূপায়িত করতে অবশ্যই সাহায্য করা চাই,···যে মূল উপাদানগুলি আমাদের সমষ্টিগত জীবনের ভিত্তি গড়বে সেগুলি হল—ন্যায়বিচার, সাম্য, স্বাধীনতা, অনুশাসন এবং প্রেম···সাম্যের ভিত্তি সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সব রকম বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে হবে···'। সুভাষচন্দ্র কোন দ্বিধা না করে ঘোষণা করেছিলেন—'আমি ভারতবর্ষে সমাজবাদী প্রজাতন্ত্র চাই··· যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে চরমপন্থী ও বিপ্লবীদের সক্রিয় করা না যায়, আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পারব না এবং নতুন কোন বাণী দিয়ে তাদের অনুপ্রাণিত না করলে আমাদের মধ্যে যে সব বিপ্লবীরা আছেন তাদের সক্রিয় করে তোলা যাবে না···'। কংগ্রেসের নীতি ও কার্যসূচীতে যথেষ্ট অস্পষ্টতা ও মানসিক স্থবিরতা থাকার জন্য সুভাষচন্দ্র দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে ঐ নীতি ও কার্যসূচী বৈপ্লবিক মতবাদের উপর নয় আপোষনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত—জমিদার ও প্রজার মধ্যে, পুঁজিবাদী ও খেটে-খাওয়া মানুষদের মধ্যে, তথাকথিত উচ্চ শ্রেণী ও তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের

মধ্যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনরকম একটা বোঝাপড়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুভাষচন্দ্র তাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্যসূচী তুলে ধরেছিলেন ঃ (১) সমাজতান্ত্রিক কার্যসূচীর ভিত্তিতে কৃষক ও শ্রমিকদের সংগঠিত করা ; (২) কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে যুবকদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে সংগঠিত করা ; (৩) জাতিভেদ প্রথা তুলে দেওয়া এবং সবরকম সামাজিক এবং ধর্মীয় কুসংস্কারগুলি দূর করা ; (৪) নতুন মতবাদ প্রচার করতে এবং নতুন কার্যসূচী রূপায়ণ করতে আমাদের নারীদের আনার জন্য নারী সংস্থাগুলিকে সংগঠিত করা ; (৫) ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী ; এবং (৬) নতুন পদ্ধতি ও কার্যসূচী প্রচারের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করা।

সুভাষচন্দ্র যদিও স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে গান্ধী-আরউইন চুক্তি অত্যন্ত অসন্তোষজনক ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক, যাঁরা ঐ চুক্তির শর্তাবলীর জন্য দায়ী তাঁদের দেশপ্রেম সম্বন্ধে তিনি কখনও প্রশ্ন করতে চাননি। ঐ পরিস্থিতিতে তিনি কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে অযথা বিরোধ এড়িয়ে তাঁর পরিকল্পিত ধারায় প্রকৃত কাজ করার জন্য আহ্বান করেছিলেন, যাতে জাতিকে এবং জাতীয় দাবীকে শক্তিশালী করা যায় এবং যাতে জাতি দুর্বল না হয় এবং প্রতিপক্ষ শক্তিশালী হয়ে না ওঠে। তিনি তারুণ্যপূর্ণ সমাবেশকে উদ্দেশ্য করে অন্যদের সমালোচনা করার সময়েও সংযত হতে ও আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে বলেছিলেন ; কারণ ভদ্র এবং সংযত হয়ে তাঁরা লাভবানই হবেন, তাঁদের কোন লোকসান হবে না।

ভারতবর্ষের যুবকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের উপসংহার করে সুভাষচন্দ্র তাঁদের ঐতিহাসিক তথ্যটি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষ হল পৃথিবীর পুনর্গঠনের একটি মূল স্তম্ভ এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সারা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করবে।

ভারতবর্ষের জনসাধারণ মনে করেছিলেন যে গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে মহাত্মাজীরই জয় হয়েছে ; কিন্তু যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং সাধারণভাবে বাম পন্থীদের মধ্যে, বিপ্লবীদের এবং ট্রেড ইউনিয়ন মহলে ঐ সমঝোতা বেশ নৈরাশ্যের সঞ্চার করেছিল। দিল্লী চুক্তির ফলে সত্যাগ্রহী বন্দীরা মুক্তি পেলেও বাঙ্গলায় এবং অন্যত্র বিপ্লবী বন্দীদের ছাড়া হয়নি ; তাঁরা অনেকদূর এগিয়ে লাটসাহেবকে লিখে জানিয়েছিলেন যে গান্ধীজীর সঙ্গে যে চুক্তি করা হয়েছে, তা মানতে তাঁরা বাধ্য থাকবেন এমন কোন কথা নেই। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে জেল থেকে মুক্তি লাভের পর সুভাষচন্দ্র এই পরিস্থিতির কথা জানতে পারেন। কয়েক মাস পরে বাঙ্গলার তৎকালীন লাটসাহেব ষ্ট্যান্‌লি জ্যাকসন্ জে, এম, সেনগুপ্তর মাধ্যমে বিপ্লবীদের সঙ্গে একটি বোঝাপড়ায় আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

করাচী কংগ্রেসের পর সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর সঙ্গে আবার ভ্রমণ করার সময় লক্ষ্য করলেন যে মহাত্মাজী সেই সময় ব্যক্তিগত মর্যাদা ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে। এপ্রিল মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত করল। সুভাষচন্দ্রের মতে এই সিদ্ধান্ত ভুল হয়েছিল। কারণ, লণ্ডনে গান্ধীজী একা পড়ে যাবেন এবং ইংরাজদের দ্বারা নির্বাচিত নানারকম বাজে লোক, স্ব-নিযুক্ত নেতা এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন লোকদের মাঝখানে তাঁকে বসান হবে, তাঁকে সমর্থন করার মত কোন লোক তাঁর পাশে থাকবে না। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেই গান্ধীজী ঘোষণা করলেন যে গোলটেবিল বৈঠকে তাঁর যাওয়া নির্ভর করছে তাঁর হিন্দু-মুসলিম প্রশ্ন সমাধান করার ক্ষমতার ওপর। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এই ঘোষণার সুযোগ গ্রহণ করল এবং মহম্মদ আলি জিন্না তাঁর 'চোদ্দ দফা' দাবী তাঁর সামনে উপস্থাপিত করলেন। সুভাষচন্দ্র সেই দিন

বিকালেই গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তাঁকে বিষণ্নমনা দেখলেন কেননা গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে জিন্নার দাবীর ভিত্তিতে কোন চুক্তি সম্ভব নয়। তারপর সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে বলেছিলেন যে জাতীয়তাবাদী হিন্দু ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মধ্যে একটি চুক্তিই কংগ্রেসের লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং জাতীয়তা-বিরোধীরা কি ভাববে বা বলবে তা চিন্তা না করে তাদের চুক্তিই জাতীয় দাবী হিসাবে ইংরাজ সরকারের কাছে উপস্থাপনা করা উচিত। গান্ধীজী স্পষ্টভাবে সুভাষকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত নির্বাচকমণ্ডলীতে তাঁর কোন আপত্তি আছে কি না। এর উত্তরে সুভাষ পরিষ্কারভাবে জানিয়েছিলেন যে ঐ ধরণের নির্বাচক-মণ্ডলী গঠন জাতীয়তাবাদের মূল নীতির বিরোধী এবং এমন কি সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে স্বরাজও গ্রহণযোগ্য নয়।

এপ্রিল মাসে সুভাষচন্দ্র নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পেলেন যে ইংরাজ সরকার গোল টেবিল বৈঠকের গোড়াতেই পূর্ণ স্বাধীনতার মৌলিক বিষয়টিকে সরিয়ে রেখে ছোটখাট এবং বিতর্কমূলক বিষয়ে গান্ধীজীকে জড়িয়ে ফেলতে সবরকম চেষ্টা করবে। ইংরাজ সরকার আশা করেছিল যে এই উপায়ে ভারতবাসীরা কোন ঐক্যবদ্ধ দাবী উপস্থাপন না করে নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে মত্ত থাকবে। সুভাষচন্দ্র এই খবর মহাত্মাজীকে জানালেন। মহাত্মাজী উত্তরে জানালেন যে লণ্ডনে পৌঁছেই তিনি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি সম্বন্ধে ইংরাজদের কাছ থেকে সন্তোষজনক উত্তর পাবার চেষ্টা করবেন। তিনি যদি সন্তুষ্ট না হন, তাহলে ইংলণ্ডে তাঁর কাজ ঐখানেই শেষ হবে। এপ্রিল মাসে লর্ড আরউইনকে বদলে গোঁড়া-সাম্রাজ্যবাদী লর্ড উইলিংডনকে বড়লাট করা হল। তাঁর পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সরকারী মনোভাব আরও কঠোর হতে লাগল এবং সরকারী কর্মচারীরা গান্ধী-আরউইন চুক্তি অমান্য করতে আরম্ভ করল। গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ এবং বাঙ্গলার পরিস্থিতি বিশেষভাবে অসন্তোষ-জনক ছিল। বাঙ্গলায় বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা চলতে লাগল

এবং একজনকেও মুক্তি দেওয়া হল না। ষড়যন্ত্র মামলাগুলি যথারীতি চলতে লাগল। মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিবকে দিল্লী চুক্তি ভঙ্গের বিস্তারিত বিবরণসহ অভিযোগপত্র দিলেন। নতুন বড়লাটের সঙ্গে তিনি দীর্ঘ আলোচনাও করলেন। কিন্তু তাতে সাধারণ পরিস্থিতির কোন উন্নতি হল না। আগষ্ট মাসে যা হোক করে গান্ধীজী এবং বড়লাটের মধ্যে একটি হতাশাব্যঞ্জক চুক্তি শেষমুহূর্তে খাড়া করা হল এবং গান্ধীজী ইংলণ্ড যাত্রা করলেন।

মহাত্মা গান্ধী প্রায় আড়াইমাস ইংলণ্ডে ছিলেন। ইংরাজ সরকার সংখ্যালঘুদের সমস্যাকে কেন্দ্রবিন্দু করে এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো কি ধরণের হবে এই দুটি প্রশ্নকে বড় করে দেখিয়ে তাঁকে বেকায়দায় ফেলতে চেষ্টা করল। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে সংখ্যালঘু কমিটির সব সদস্য ইংরাজ সরকার কর্তৃক মনোনীত হওয়ায় সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসার সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। ১৯২৯ সালের নভেম্বরে প্রাচীন নেতাদের দিল্লী ঘোষণার বিপক্ষে সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁর সহযোগীরা যে মত প্রকাশ করেছিলেন, তাতে এই ফলাফলই প্রত্যাশা করা হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের মতে ইংরাজদের বাছাই করা কয়েকজনের অনিষ্টকর নীতি ব্যর্থ করতে মহাত্মাজী যদি মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জাতীয়তাবাদী প্রতিনিধিদের একটি পুরো দল নিয়ে লণ্ডনে যেতেন, তাহলে ফলাফলের এক বিরাট পার্থক্য হত। ইংরাজ সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট সংখ্যালঘুদের তথা-কথিত প্রতিনিধিদের দিয়ে একটি সংখ্যালঘু চুক্তি করানো হয়েছিল। এই চুক্তিতে যে কেবল অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য কয়েকটি আসনের প্রতিশ্রুতি ছিল তাই নয়, এমন কি তাদের জন্য পৃথক নির্বাচক-কেন্দ্রেরও প্রতিশ্রুতি ছিল। ইংরাজ প্রধানমন্ত্রী দাবী করেছিলেন যে সংখ্যালঘু চুক্তি ভারতবর্ষের ১১৫০ লক্ষ লোকের পক্ষে গ্রহণযোগ্য এবং তিনি এই বলে গান্ধীজীর মতবাদের প্রতিবাদ করেছিলেন যে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসায় আমাদের ব্যর্থতা একটি সর্বজন-স্বীকৃত ভারতীয় সংবিধান রচনার অগ্রগতি ব্যাহত করছে। কংগ্রেস

ভারতের জনগণের শতকরা ৮৫ ভাগের প্রতিনিধিত্ব করে-এই দাবী করে মহাত্মাজী জোরের সঙ্গে এরকম অতিশয়োক্তির প্রতিবাদ করেছিলেন। নভেম্বর মাসে সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যাতে বোঝা গিয়েছিল যে তার বিভ্রান্তি পুরোপুরি দূর হয়েছে।

সুভাষচন্দ্রের মতে মহাত্মাজীর লণ্ডন যাত্রা সুপরিকল্পিত হয়নি এবং তাঁর সহযাত্রীদের মধ্যে ভাল এবং উপযুক্ত পরামর্শদাতা ছিল না। উপরন্তু তাঁর মতে ১৯৩০ সালে মহাত্মাজীর লণ্ডনে যাওয়া উচিত ছিল, কারণ তখন তিনি ইংরাজদের কাছ থেকে আরও ভাল শর্তাবলী আদায় করতে পারতেন। অক্টোবর মাসে যখন টোরীরা ইংলণ্ডে ক্ষমতায় ফিরে এলেন, তখন মীমাংসার শেষ আশাটুকুও মিলিয়ে গেল।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবীকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসাবে তুলে ধরতে গান্ধীজীর বিদেশ যাত্রাকে কাজে লাগান হয়নি, সেজন্য সুভাষচন্দ্র দুঃখিত হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র ভেবেছিলেন যে ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে যে সব ব্যক্তির গুরুত্ব আছে তাদের সঙ্গে গান্ধীজীর যোগাযোগ করিয়ে দেবার কোন চেষ্টাই করা হয়নি এবং ইয়োরোপের ভূখণ্ডে তিনি খুব অল্প সময় কাটিয়াছিলেন।

১৯৩১ সালের শেষ দিনে গান্ধীজী ভারতে ফিরে এলেন এবং দেশে তাঁকে খুব আন্তরিকতাপূর্ণ ও সাদর অভ্যর্থনা জানান হল। যখন তিনি দেশের বাইরে, সরকার তখন নির্দয় দমননীতি আরম্ভ করবার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করেছিলেন। অপরদিকে যুব ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানগুলি, যারা গোড়াতেই গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুমোদন করে নি, তারা আগামী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি এবং অভিযান আরম্ভ করে দিল। মে মাসে সুভাষচন্দ্র ভারত সভার প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন। জুলাই মাসে তিনি অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন ; এখানে দিল্লী চুক্তি অগ্রাহ্য হয়েছিল। বাঙ্গলার বিপ্লবীরা সরকারের অত্যাচারে

উত্যক্ত হয়ে প্রতিহিংসায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সূত্র ধরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাতে লাগলেন। সরকারও এদিকে বহু জেলায় ভিন্ন আকারে সামরিক আইন বলবৎ করে দমননীতি আরও জোরদার করল। এইভাবে সরকারের দমননীতি, বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ এবং আমলাতান্ত্রিক প্রতি-সন্ত্রাসবাদের দুষ্টচক্র চলতে থাকল। এমনকি গান্ধী-আরউইন চুক্তির সময়কালেও কয়েকজন বিপ্লবী বন্দীর মৃত্যুদণ্ড এবং ফাঁসিও হয়েছিল। ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত বাঙ্গলার রাজনৈতিক সম্মেলন বামপন্থী মতবাদ সমর্থন করল যে সরকার চুক্তির শর্তাবলী অমান্য করেছে, সুতরাং কংগ্রেসের উচিত আইন অমান্য আবার সুরু করা। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সরকার খান্ আব্দুল গফ্ফর খানের নেতৃত্বে পরিচালিত 'খুদাই খিদমত্গার' বা লাল সার্ট স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর কঠোর অত্যাচার সুরু করল। জনৈক সমাজতন্ত্রী ইংরাজ লেখক ব্রেলস্ফোর্ড সফরের পর সুভাষচন্দ্রকে বলেছিলেন যে যুক্ত প্রদেশে পরিস্থিতি ভূমি বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

সরকারের আসল মনোভাব কি তার ব্যাখ্যা চেয়ে মহাত্মাজী এদেশে ফেরার পরই লর্ড উইলিংডনকে চিঠি দিয়েছিলেন। বড়লাট তার নেতিবাচক এবং বিরূপ উত্তর দিয়েছিলেন। তারপর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করল বড় লাট তা গ্রহণযোগ্য মনে করলেন না এবং গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করলেন। এভাবে দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলন আবার সুরু করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হল।

## ১৬

১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ইংরাজ সরকার সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেস এবং জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু করল। গান্ধীজী, জওহরলাল এবং সুভাষচন্দ্র সহ নেতাদের ব্যাপকহারে গ্রেপ্তার করা হল। ১৯৩০ সালে সরকার

গান্ধীজীর গণ-প্রতিরোধের নতুন ধরণ দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৩১ সালের মধ্যে সরকার আইন অমান্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সব আয়োজন পাকাপাকি করে ফেলেছিল। বছরের প্রথম চার মাসে আশি হাজারেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হল, কংগ্রেস সংগঠনগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হল এবং নির্দয় অত্যাচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল, যেমন লাঠিচার্জ, এলোমেলো গুলিচালনা, ব্যাপকহারে জরিমানা আরোপ করা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ, ব্যাপক খানাতল্লাস ও হয়রানী প্রভৃতি। এমন কি জেলের ভেতরেও রাজনৈতিক বন্দীদের নির্দয় শাস্তি দেওয়া হত, যথা, পায়ে ডাণ্ডা বেড়ি পরান, রাত্রে হাতকড়া লাগান, চটের কাপড়চোপড় পরান ইত্যাদি। ভারতের জনগণ বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু এবারে তারা একটু অসুবিধার মধ্যে পড়েছিল, কারণ শত্রুপক্ষ ছিল অত্যন্ত নির্দয় এবং পুরোপুরি প্রস্তুত।

১৯৩২ সালে জানুয়ারী মাসে গ্রেপ্তারের পর সুভাষচন্দ্রকে মধ্যপ্রদেশের একটি অখ্যাত জায়গা সিউনির একটি ছোট জেলে রাখা হয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যেই তার মেজদাদা, কলিকাতার অন্যতম প্রধান আইনজীবী, সামনের সারির কংগ্রেসী এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান শরৎচন্দ্র বসুকেও সেখানে আনা হল। শৈশব থেকেই সুভাষ তাঁর মেজদাদা এবং মেজবৌদিদি বিভাবতীর বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। জীবনের প্রতিটি সঙ্কটের মুহূর্তে সুভাষ তাঁর মেজদাদা শরৎচন্দ্রের মতামত, পরামর্শ ও সমর্থন চাইতেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য দুই-ভাই-এর এবার একইসঙ্গে নির্যাতন ভোগ সুরু হল। আদর্শবাদে, দেশসেবায় এবং দুঃখবরণে দুই ভাই-এর সারাজীবন একসাথে একই পথে চলা ইতিহাসের এক অনন্য নিদর্শন।

১৯৩২ সালের আগষ্ট মাসে ইংরাজ সরকার তথাকথিত সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করল, যাতে ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে অনুন্নত

সম্প্রদায় এবং অন্যান্য জাতীয় সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং তার চেয়েও ক্ষতিকর যে প্রস্তাব ছিল সেটা হল পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা। সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলীর প্রশ্নে তাঁর মতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি হিন্দুদের প্রধান ধারা থেকে অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমরণ অনশন সুরু করবেন এই কথা জানিয়ে মহাত্মাজী ইংরাজ প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এই সংবাদে সমগ্র জাতির মধ্যে উদ্বেগ এবং আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়েছিল। পুনায় তাঁর কারাকক্ষে গান্ধীজী যখন অনশন করছিলেন তখন দেশের চারিদিক থেকে অনশন থেকে বিরত হবার জন্য তাঁর কাছে আকুল আবেদন পাঠান হচ্ছিল। বোম্বাইতে বিভিন্ন মতাবলম্বী হিন্দু নেতাদের একটি সম্মেলন হল। দীর্ঘ সলাপরামর্শের পর পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে একটি মীমাংসায় আসা সম্ভব হল। পুনা চুক্তির কথা ইংরাজ সরকারকে জানান হল; তারা এটি অনুমোদন করে পার্লামেণ্টে পাঠান ছাড়া আর কোন উপায় দেখল না। এর পর মহাত্মাজী অনশন ভঙ্গ করলেন।

১৯৩০ সালের মত ১৯৩২ সালেও সুভাষচন্দ্র কারার অন্তরাল থেকে ঘটনা প্রবাহের প্রতি লক্ষ্য রাখছিলেন। গান্ধীজীর অনশনকে কেন্দ্র করে আবেগের এবং তাঁর জীবনরক্ষার জন্য দেশবাসীর স্বাভাবিক উদ্বেগে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নটি আবার ধামাচাপা পড়ে যাওয়ায় তিনি বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন যে ইংরাজ সরকার এবার কংগ্রেসকে বেকায়দায় ফেলেছে। বছরটি যত শেষ হয়ে আসছিল, কংগ্রেসীরা আইনঅমান্য ছেড়ে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী অভিযান এবং মন্দির প্রবেশ আইন নিয়ে বেশি মেতেছিল।

সিউনি সাব জেলে শরৎ ও সুভাষ দুই ভাই-এর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি হচ্ছিল। তাঁদের প্রথমে জব্বলপুর সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হল। সেখান থেকে সুভাষকে লোক-দেখানো ডাক্তারী পরীক্ষা এবং চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল—প্রথমে

মাদ্রাজে, তারপর ভাওয়ালিতে এবং তারপর লক্ষ্ণৌয়ে। কিন্তু তাঁর অসুস্থতার যথাযথ কারণ নির্ণীত হল না, কোন চিকিৎসায় তাঁর কোন উপকারও হল না। বর্মায় নির্বাসনের সময় তিনি যেরকম অস্থিচর্মসার হয়ে গিয়েছিলেন, আবার সেরকম হল। বন্দী শরৎচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রী বিভাবতী সুভাষের পক্ষে দিল্লীতে সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে লাগলেন। তিনি সরকারের অত্যন্ত কঠোর মনোভাবের পরিচয় পেলেন। অবশেষে সুভাষচন্দ্রকে চিকিৎসা এবং আরোগ্যের জন্য ইয়োরোপে পাঠান স্থির হল। ইংরাজ সরকার কোন অবস্থাতেই, এমন কি তাঁর অসুস্থ বৃদ্ধ পিতামাতাকে দেখতে যাবার জন্যও তাঁকে মুক্তি দিতে রাজী হয়নি। তারা বিদেশে তাঁর যাওয়ার এবং চিকিৎসার কোন দায়িত্বও নিল না।

ইয়োরোপে যাবার আগে সুভাষচন্দ্রকে অল্প সময়ের জন্য জব্বলপুর জেলে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল—সেখানে তাঁর মেজদাদা আটক ছিলেন। তাঁদের পরিবারের কয়েকজন এবং দেশবন্ধুর বিধবা পত্নী বাসন্তী দেবী তাঁকে বিদায় জানাবার জন্য জব্বলপুরে এসেছিলেন। ১৯৩৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী ইটালীয়ান জাহাজ 'এস. এম. গঙ্গে'তে তিনি আর একটি বাধ্যতামূলক নির্বাসনে ইয়োরোপ যাত্রা করলেন।

১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে সুভাষ ভিয়েনায় পৌঁছলেন। সেখানে তিনি অনেক ভাল ডাক্তার পেলেন এবং তাঁর সন্তোষজনক চিকিৎসাও হল। একটু সুস্থ বোধ করতেই তিনি ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে সক্রিয় আগ্রহ নিতে লাগলেন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জনজীবনের প্রতিটি স্তরে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে লাগলেন। বিঠলভাই প্যাটেলের মধ্যে তিনি একজন সহযাত্রী ও সহমর্মী খুঁজে পেলেন, যিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও লক্ষ্যের আন্তর্জাতিক স্বপক্ষে সমর্থন সংগ্রহে তাঁরই মত আগ্রহী ছিলেন।

এদিকে ভারতবর্ষে কংগ্রেসীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আইন অমান্য আন্দোলন আবার জোরদার করার চেষ্টা করছিলেন। জানুয়ারী

মাসে স্বাধীনতা দিবস দেশের বহু জায়গায় বিশেষ উদ্দীপনার মধ্যে প্রতিপালিত হল। ইংরাজ সরকার মার্চ মাসের মাঝামাঝি সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাবগুলি নিয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করল। তার অল্পদিন পরেই এপ্রিল মাসে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করা হল। সরকার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচিত সভাপতি মদনমোহন মালব্য সহ যাঁরা তখনও মুক্ত ছিলেন সেই সব নেতাদের গ্রেপ্তার করল। তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত শ্রীমতী জে. এম. সেনগুপ্তকে সভাস্থলেই গ্রেপ্তার করা হল। শ্বেতপত্রের নিন্দা ও সেটি প্রত্যাখ্যান করে কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবটিই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচিত সভাপতি মালব্যজী যথাযথভাবেই দেশবাসীর মনোভাব সংক্ষেপে প্রকাশ করে বলেছিলেন যে পনের মাসে সরকার কংগ্রেসকে ভাঙতে পারেনি এবং পনের মাসের দ্বিগুণ সময়েও সরকার তা পারবে না। তা সত্ত্বেও মে মাসে একদিন সকালে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত করে দিয়েছেন শুনে সমগ্র দেশ চমকে গেল। সেই সময় তিনি অনশনে ছিলেন, সুতরাং সে সময়ে সব শান্ত ও নিরাবেগ বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ সম্ভব ছিল না। যাই হোক ইংরাজ সরকার তার প্রতিদান দেয়নি। তারা দমন-নীতিমূলক অর্ডিনান্সগুলি তুলে নিতে অথবা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে অস্বীকৃত হল। গান্ধীজীর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সুভাষচন্দ্র বসু এবং বিঠলভাই প্যাটেল ভিয়েনা থেকে একটি কঠোর যুক্ত বিবৃতি দিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যে এই সিদ্ধান্তে কার্যতঃ গত তেরো বছরের সব কাজ এবং স্বার্থত্যাগ নষ্ট হল। তাঁরা আরও বৈপ্লবিক নীতি এবং নেতৃত্বের দাবী করেছিলেন। গান্ধীজী এবং অন্যান্য প্রবীণ নেতাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং উচ্চ ধারণা থাকা সত্ত্বেও জাতীয় নীতির বিষয়ে সুভাষচন্দ্র সর্বদাই অত্যন্ত মন খোলা এবং স্পষ্টবক্তা ছিলেন। অনেকে অবশ্য মনে করেছিলেন যে গান্ধীজী যখন অনশনরত, সেই সময় প্রকাশ্যে তাঁর সমালোচনা করা অত্যন্ত অসংযত কাজ হয়েছিল।

আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত হয়ে যাবার অল্পদিন পরেই

সুভাষচন্দ্র লণ্ডনে একটি রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ইংরাজ সরকার চালাকী করে ইটালী এবং অষ্ট্রিয়া কেবলমাত্র এই দুটি দেশের নাম পাশপোর্টের উল্টো পিঠে লিখে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল! তিনি ব্রিটেন সহ অন্য দেশে যেতে পারবেন না এই ধারণা করে দেবার জন্যই এটি করা হয়েছিল। তাই তিনি তাঁর সভাপতির ভাষণ লিখে লণ্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই ভাষণটি তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রচনা বলে গণ্য করা হয় এবং ব্রিটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কৌশল এবং ভারতীয় বিপ্লবের শেষ লক্ষ্য যাকে তিনি 'সাম্যবাদ' আখ্যা দিয়েছিলেন—এই দুই বিষয়েই তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক প্রস্তুতি যে ইতিমধ্যেই অনেক এগিয়ে গিয়েছিল তার পরিচয় এই লেখাটি থেকে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত ভাষায় তিনি ভারতের নিয়তিতে তাঁর বিশ্বাসের ব্যাখ্যা করেছিলেন "......সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক সরকার সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান ধারণার মাধ্যমে বিশ্ব সভ্যতায় উল্লেখযোগ্য অবদান করেছিল। একই ভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স তার 'স্বাধীনতা, সাম্য মৈত্রী'র চমৎকার বাণী বিশ্বের সভ্যতাকে উপহার দিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া বিত্তহীন শ্রেণীর বিপ্লবে, সরকারে এবং সংস্কৃতিতে তার কীর্তির মাধ্যমে বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ভারতবর্ষকে আহ্বান করা হবে।"

## ১৭

ইয়োরোপ প্রবাসের সময় সুভাষচন্দ্র নিজে ভারতীয় জাতীয়তা-বাদের বেসরকারী ভূমিকা নিয়েছিলেন। যদিও অষ্ট্রিয়ায় তাঁর কাজ সুরু হয়েছিল, তিনি তাঁর কার্যকলাপ ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে যথা, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড, হাঙ্গেরী, ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মাণী এবং ফ্রান্সেও ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ইংরাজ সরকার তাঁকে

বিশেষভাবে জার্মাণী এবং ইংলণ্ডের বাইরে রাখতে চেয়েছিল, কারণ তিরিশের দশকে ঐ তুই দেশে বহু ভারতীয় ছাত্র পড়াশুনা করতেন অথবা উচ্চতর প্রযুক্তিবিদ্যায় শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন। তাদের ভয় ছিল যে সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর বৈপ্লবিক সংগ্রামী মতবাদে ছাত্র সমাজকে প্রভাবিত করবেন এবং জাতীয় আন্দোলনে তাদের টেনে আনবেন।

সুভাষচন্দ্র যে কেবল এইসব ইয়োরোপীয় দেশের রাজনৈতিক দলের লোকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করছিলেন তাই নয়, তিনি সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে, সাহিত্যিক, অর্থনীতিবিদ, সমাজ-বিজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক জগতের নারী ও পুরুষদের সঙ্গেও যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন। তিনি অনেক ইয়োরোপীয়ান পণ্ডিত ও লেখকদের সঙ্গেও চিঠিপত্র আদন প্রদান করেছিলেন। তিনি বহু জায়গায় ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, ভারতীয় ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের সংগ্রামে তিনি সব শ্রেণীর লোকদের নৈতিক সমর্থন লাভ করতে চেয়েছিলেন। ভিয়েনায় তিনি অষ্ট্রিয়া-ভারত সোসাইটি স্থাপন করেছিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ায় একদিকে তিনি চিকিৎসা করাচ্ছিলেন, অন্যদিকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপন করছিলেন। প্রাগে তিনি তৎকালীন চেক বিদেশ মন্ত্রী এডওয়ার্ড বেনেসের সঙ্গে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক আলোচনা করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশের বাইরে চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং অর্জনে যারা সংগ্রাম চালিয়েছিল, চেকোশ্লোভাকিয়ার সেই সৈনিকদের জাতীয় সঙ্ঘ ( Legion ) প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। চেকোশ্লোভাক-ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠনেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং ১৯৩৪ সালে এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের জন্য পোলাণ্ডের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে লক্ষ্য করে ভারতবর্ষের সংগ্রামে তিনি পোলিশ বন্ধুদের উৎসাহ উদ্দীপিত করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রাশিয়ার শাসন থেকে

পোলাণ্ডকে মুক্ত করার জন্য জাপানে পোলিশ সৈন্যবাহিনীকে যে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে অনুশীলন করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের ইয়োরোপে থাকাকালীন হিটলার এবং ন্যাশনাল সোস্যালিষ্ট পার্টি কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পর ইয়োরোপীয় রাজনীতির কেন্দ্রস্থল জার্মাণীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। দক্ষিণে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ইটালী আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছিল এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ব্রিটিশ আধিপত্যের প্রতিযোগী হয়ে উঠছিল। ইংলণ্ডে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসার পথে মহাত্মা গান্ধীকে মুসোলিনী রোমে উষ্ণ ও উদ্দীপনাময় সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। বার্লিনে ইণ্ডো-জার্মাণ সোসাইটি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জার্মাণ বিদেশ অফিসের আমলাদের আলাপ-আলোচনা করার ব্যবস্থা করেছিল। এই সব আলোচনায় বিশেষ ফল হয়নি। কারণ ব্রিটেনের প্রতি হিটলারের দোমনা মনোভাব এবং ঔপনিবেশিক এবং পরাধীন জাতিগুলি সম্বন্ধে তার প্রতিক্রিয়াশীল মতামতের জন্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ইংরাজদের সংগ্রামে ন্যাশনাল সোস্যালিষ্ট পার্টির প্রভাবশালী গোষ্ঠী নিরপেক্ষ থাকাই সমীচীন মনে করেছিল। ঐ দলে অবশ্য কিছু ভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠী ছিল যারা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক এবং পরাধীন জাতিগুলির সঙ্গে একই শত্রুর বিরুদ্ধে হাত মেলাতে চেয়েছিল। এই ধরণের ভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠী সুভাষচন্দ্রকে কথা দিয়েছিল যে বাঙ্গলায় বিপ্লবী সংগঠনগুলিকে গোপনে সাহায্য করার জন্য তারা প্রস্তুত থাকবে। যে সব ভারতবাসী জার্মাণীতে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত ছিলেন সুভাষচন্দ্র তাঁদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে রাজনৈতিক নির্বাসনে ছিলেন এবং যাঁরা ভারতবর্ষে বিদ্রোহ গড়ে তোলার জন্য জার্মাণ বিদেশ দপ্তরের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। অন্যরা জার্মাণ সমাজবাদীদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। তাছাড়া ছিল তরুণ ছাত্ররা যারা ভারতবর্ষ থেকে সবে গিয়ে পৌঁছেছিল। শেষোক্ত

দলটিকে এ. সি. এন. নামবিয়ার পরিচালিত করছিলেন। তিনি বার্লিনে ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষে ভারতীয় তথ্য কেন্দ্র গঠন করেছিলেন।

আমলাতান্ত্রিক চক্রের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা নিষ্ফল হওয়ায় সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের পক্ষে সংবাদপত্রে বিবৃতি ও বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচার কাজে বেশী মনোযোগ দিলেন এবং বিদগ্ধ মহলে যোগাযোগ গড়ে তুললেন। সুভাষচন্দ্র মিউনিকের জার্মাণ একাডেমীর ডিরেক্টর ফ্রান্জ্ থিয়েরফেল্ডার-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলেন এবং তাঁরা ইন্দো-জার্মাণ সহযোগিতার একটি কার্যসূচী প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু সেটা সরকারী মহলে সন্তোষজনক সাড়া জাগায় নি। ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে ইয়োরোপ থেকে ভারতে ফিরে আসার সময় থিয়েরফেল্ডারকে একটি চিঠিতে সুভাষচন্দ্র নাৎসি জার্মাণীর নীতিতে বিরক্তি এবং নৈরাশ্য প্রকাশ করে এইভাবে লিখেছিলেন ঃ

"মিউনিকে হের হিটলারের সাম্প্রতিক বক্তৃতায় নাৎসি দর্শনের সার বস্তু পাওয়া যায়······যার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খুব দুর্বল···আমি জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে একথা বলা ঐতিহাসিকভাবে মিথ্যা যে ইয়োরোপ ও এশিয়া পরস্পরের সঙ্গে শান্তিতে থাকতে পারবে না। জার্মাণীর নতুন জাতীয়তাবাদ স্বার্থপরতা ও জাতিগত ঔদ্ধত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত···যখন আমরা বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যের সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতার জন্য, আমাদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছি··· আমাদের জাতির অথবা সংস্কৃতির ওপর আমরা কোন আক্রমণ সহ্য করতে পারি না।"

যুক্তিপূর্ণ ঐতিহাসিক কারণে ইটালীর প্রতি সুভাষচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ ছিল। বিভক্ত এক জাতি কি করে জাতীয় ঐক্য সাধন করেছিল এবং অবশেষে জাতীয় মুক্তি লাভ করেছিল, যার ফলে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ভারতীয় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক দৃষ্টান্ত ছিল। 'কার্বোনিয়েরী' নামে পরিচিত ইটালীর বিস্তৃত গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলন যাকে ইটালীর স্বাধীনতার

অগ্রদূত বলা যায় এবং 'রিসোরজিমেণ্টো' যার দ্বারা ইটালীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সুভাষচন্দ্র এগুলির সংগঠন সম্বন্ধে গভীর মনোযোগের সঙ্গে অনুশীলন করেছিলেন। ইয়োরোপে বন্ধুদের সঙ্গে এবং ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে কথাবার্তা প্রসঙ্গে তিনি প্রায়ই ম্যাৎসিনির উল্লেখ করতেন; ম্যাৎসিনি ছিলেন 'ইয়ং ইটালী'র স্রষ্টা, যিনি স্বাধীনতার জন্য এবং রাষ্ট্রে প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত ইটালীয়ানদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। এটা উল্লেখযোগ্য যে জাতীয় ঐক্য এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একটি ছোট কিন্তু সুসংগঠিত বিপ্লবী অগ্রগামী দল গড়ে তোলার চেষ্টায় সুভাষচন্দ্র বসু বহুভাবে ম্যাৎসিনির ঐতিহাসিক সমতুল ছিলেন। তিনি ইয়োরোপে তাঁর বন্ধুদের বলেছিলেন যে কেবল যুবকেরাই নতুন শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী চেতনার অগ্রদূত হতে পারে—যখন ডাক আসবে তখন এই ধরণের অনুপ্রাণিত ও শিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকেরাই ভারতের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে পিছপা হবে না। একবার রোম পরিদর্শনের সময় মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর কৌতূহলোদ্দীপক কথাবার্তা হয়েছিল। তিনি সুভাষচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ভারতবর্ষ যে শীঘ্রই স্বাধীন হবে এটি তিনি সত্যিই এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন কি না? সুভাষ উত্তরে জোর দিয়ে বলেছিলেন—হ্যাঁ। মুসোলিনী তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি সংস্কার পন্থী বা বিপ্লবাত্মক উপায়ে বিশ্বাস করেন। সুভাষ উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি বিপ্লবাত্মক পথ সমর্থন করেন। মুসোলিনী উত্তর দিয়েছিলেন 'তাহলে অবশ্যই আপনারা সফল হবেন।'

আর যে দেশটি সুভাষচন্দ্রকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল সেটি হল তুরস্ক, যেখানে মৌলিক পরিবর্তন ঘটান হয়েছিল এবং মুস্তাফা কেমাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে সারা দেশ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন যে ভারতবর্ষ এবং তুরস্কের কতকগুলি এক ধরণের সমস্যা আছে এবং দু'দেশেরই অনেক একই ধাঁচের সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন। তুরস্কদেশকে আধুনিক করে তোলার জন্য যা যা তাদের

প্রয়োজন হয়েছিল, তিনি ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং প্রশাসনিক সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সেগুলি কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। জার্মাণী থেকে প্রযুক্তিবিদ্যা এবং সামরিক দক্ষতা আনিয়ে কেমাল আতাতুর্ক কি করে একটি প্রাচ্য দেশকে আধুনিক করে তুললেন এটি জানবার জন্য তিনি বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত ছিলেন। সমগ্র তুরস্কবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার সূত্র হিসাবে প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় লিপিগুলির বদলে রোমান লিপি গ্রহণ করে ভাষাগত বিষয়ের সংস্কারের জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, তা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। এই সব বিষয়ে অনুসন্ধান ও অনুশীলন করতে গিয়ে তিনি কেমাল আতাতুর্কের সত্যিকারের এক গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

১৯৩৪ সালের শেষের দিকে সুভাষচন্দ্র খবর পেলেন যে তাঁর বাবা জানকীনাথ সঙ্কটজনকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর পরিবারের লোকেরা চেয়েছিলেন যে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে এসে তাঁর বাবার শেষ শয্যার পাশে দাঁড়ান। তিনি খুব কম সময়ে ভারতে পৌঁছবার জন্য বিমানে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এসে পৌঁছতে দেড়দিন দেরী হয়েছিল, তাঁর বাবা ইতিমধ্যে পরলোকগমন করেছিলেন এবং তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। সুভাষ কলিকাতায় পৌঁছান মাত্রই তাঁকে তাঁর এলগিন রোডের বাড়ীতে অন্তরীণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে বন্দী হিসাবেই তিনি সেখানে প্রায় একমাস ছিলেন। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসের গোড়ায় তিনি আবার তাঁর চিকিৎসা চালিয়ে যাবার জন্য এবং ভারতবর্ষের জন্য কাজ করতে ইয়োরোপে ফিরে গেলেন।

## ১৮

ইয়োরোপে তাঁর নির্বাসনের সময় সুভাষচন্দ্র প্রামাণ্য গ্রন্থ—"দি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল" এর প্রথম এবং বড় অংশটাই লিখেছিলেন। লিখতে তাঁর এক বছরের কিছু বেশী সময় লেগেছিল; যখন তাঁর শরীর

মোটেই ভাল ছিল না। তার ওপর যদিও লেখাটি ছিল ঐতিহাসিক বর্ণনাত্মক, কাছে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি না থাকায় তাঁকে প্রধানতঃ নিজের স্মৃতির ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে বইটি লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষের ইংরাজ সরকার লণ্ডনস্থ ভারত সচিবের অনুমোদন নিয়ে বইটি ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিল এই অজুহাতে যে বইটি সন্ত্রাসবাদে এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামে উৎসাহ দেবে।

ভারতবর্ষের পড়ুয়া জনগণের ওপর তখন এই বইটির কি প্রভাব হতে পারত তা কেবল অনুমানই করা যেতে পারে। যাই হোক বিলাতের সংবাদপত্রগুলিতে বইটির খুবই ভাল সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল এবং ইয়োরোপীয় রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিক মহলে বইটি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান লিখেছিল—'ভারতবর্ষের রাজনীতির ওপর একজন ভারতীয় রাজনৈতিকের লেখা এই বই সম্ভবতঃ সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক···বইটির গুরুত্ব অবশ্য অনেকাংশে বেড়ে গেছে এইজন্য যে এই বইটির লেখক ভারতীয় রাজনীতির তিনজন সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।···গত চোদ্দ বছরের যে ইতিহাস তিনি লিখেছেন সেটা বামগোষ্ঠীর স্বীকৃত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা হলেও সব দলের পক্ষে এবং সকলের পক্ষে প্রায় নিরপেক্ষ, যা একজন সক্রিয় রাজনীতিবিদের কাছে ন্যায়সংগতভাবে আশা করা যায়। সান্‌ডে টাইমস লিখেছিল—'জনমত জাগ্রত করার জন্য দি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল একটি মূল্যবান বই।' ডেইলী হেরাল্ডের কূটনৈতিক সংবাদদাতা নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করেছিলেন—'এটি শান্ত, যুক্তিযুক্ত ও ধীর চিত্তে লেখা। আমার মনে হয় বর্তমান ভারতবর্ষের রাজনীতি বিষয়ে আমি যা পড়েছি এটি তার মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য লেখা।···এটির লেখক মোটেই গোঁড়া নন, কিন্তু এক অনন্য সক্ষম মানসিকতার অধিকারী···একটি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, চিন্তাশীল, গঠনমূলক চরিত্রের লোক যিনি বয়সে চল্লিশের কম হলেও যে কোন দেশের রাজনৈতিক জীবনের সম্পদ এবং অলঙ্কার বলে গণ্য

হতে পারেন।' দি নিউজ ক্রনিকল্ মন্তব্য করেছিল—'একজন বিপ্লবীর পক্ষে তাঁর চিন্তা আসাধারণভাবে স্বচ্ছ,...একজন প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দীর মত তাঁর প্রামাণিক তথ্যগুলিতে সেই গুরুত্ব আছে।' ভারতবর্ষে বইটি নিষিদ্ধ হবার পর বামপন্থী ইংরাজ রাজনীতিবিদদের এবং সাহিত্য মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। জর্জ ল্যান্সবেরী এই কথা বলে একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন—'বইটির জন্য তাঁকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিও ; বইটি আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়ছি এবং বইটি থেকে আমি অনেক কিছু শিখছি...।' ফরাসী পণ্ডিত রোমেঁ রোলাঁ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—'ভারতীয় বিপ্লবের ইতিহাসের জন্য এটি একটি অপরিহার্য বই। বইটিতে আপনি একজন ঐতিহাসিকের শ্রেষ্ঠ সব গুণগুলি স্বচ্ছ চিন্তা ও বিচারবুদ্ধি দেখিয়েছেন। প্রাঞ্জলতা এবং উঁচু ধরণের মানসিক সমতা...আমি আপনার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রশংসা করি...'। প্রেসিডেন্ট ডি. ভ্যালেরা লিখেছিলেন—'আমি আশাকরি অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করবেন এবং সুখী হবেন।' রোমে সুভাষচন্দ্র নিজে বইটির একটি কপি মুসোলিনীকে দিয়েছিলেন এবং তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন।

ইয়োরোপীয় সব দেশগুলির মধ্যে আয়ার্ল্যাণ্ড ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিল। অন্য দিক থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা, বিশেষ করে বাঙ্গলার বিপ্লবীরা একই শত্রুর বিরুদ্ধে আইরিশদের সংগ্রামে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ইয়োরোপে থাকা কালে সুভাষচন্দ্র কাছে থেকে আয়ার্ল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা অনুশীলন করার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আইরিশ বিপ্লবীরা বিদেশ থেকে, বিশেষ করে ইয়োরোপীয় মহাদেশে ইংরাজদের পরম্পরাগত শত্রু জার্মাণীর কাছ থেকে সমর্থন সংগ্রহ করতে যেসব উপায় অবলম্বন করেছিল, তিনি সেগুলি যত্নসহকারে অনুধাবন করেছিলেন। তুলনামূলক চর্চা করে সুভাষ আয়ার্ল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে কৌতূহলোদ্দীপক এবং নিশ্চিতভাবে এক

সম রাজনৈতিক ধারা খুঁজে পেয়েছিলেন। বার্লিন থেকে সুভাষচন্দ্র ডি. ভ্যালেরার সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালের গোড়ায় দুই নেতা ডাবলিনে মিলিত হন এবং পারস্পরিক প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রগুলির মধ্যে বিতরণের জন্য সুভাষচন্দ্র ইংরাজী, ফরাসী ও জার্মাণ এই তিনটি ভাষায় ভারতবর্ষের ওপর বুলেটিন প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। সুভাষচন্দ্রের আয়ার্ল্যাণ্ড পরিদর্শনের ফলে প্রখ্যাত আইরিশ বিপ্লবী মাদাম্ মড্ গণ্ ম্যাক্‌ব্রাইডের নেতৃত্বে কার্যরত ইণ্ডো-আইরিশ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ তাদের কাজকর্মে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল।

১৯৩৪ সালে সুভাষচন্দ্র যখন ইউরোপে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মঞ্চে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির আবির্ভাব ঘটল। ভারতীয় রাজনীতিতে বাম ধারার এই আবির্ভাবকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন; কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে এই আবির্ভাব সঠিক ঐতিহাসিক বিকাশের ইঙ্গিত বহন করছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মতে সমাজবাদীদের মধ্যে আদর্শগত একতার অভাব ছিল, তাদের কিছু ধ্যান ধারণা ছিল বহু পুরানো; তাদের প্রয়োজন ছিল একটি পরিষ্কার রাজনৈতিক আদর্শবাদের, কর্মসূচীর ও কাজের পরিকল্পনার। সংক্ষেপে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন যে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলকে আপামর জনগণের স্বার্থে কাজ করতে হবে, কায়েমী স্বার্থের জন্য নয়। দলকে ভারতবর্ষের জনগণের পূর্ণ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য লড়তে হবে। ভারতবর্ষের জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে, কিন্তু কয়েক বছরের জন্য ভারতবর্ষকে নিজের পায়ে দৃঢ়-ভাবে দাঁড় করাবার জন্য সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে। তাকে নির্ভর করতে হবে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার সঠিক পদ্ধতির ওপর এবং দেশের কৃষি ও শিল্প জীবনের পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। জাতি প্রথার মত সামাজিক বন্ধনগুলির অবসান ঘটিয়ে অতীতের গ্রাম্য সম্প্রদায় বা

গ্রাম্য 'পঞ্চ'-এর ভিত্তিতে নতুন সামাজিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। দল জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করে সারা ভারতবর্ষের জন্য জমির মালিকানার ক্ষেত্রে এক সমান নীতি চালু করবে। পার্টি মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগের অর্থে গণতন্ত্র সমর্থন করবে না; পরন্তু অরাজকতা দূর করতে এবং ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করার একমাত্র উপায় হিসাবে সামরিক অনুশাসনে ঐক্যবদ্ধ একটি শক্তিশালী দলের দ্বারা সরকার গঠন সমর্থন করবে। পার্টি চাইবে সমস্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলিকে একটি জাতীয় কার্যনির্বাহীর অধীনে যুক্ত করতে যাতে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুক্তভাবে এবং একই সঙ্গে কর্মকাণ্ড চালু হয়।

সুভাষচন্দ্র মত প্রকাশ করেছিলেন যে ভারতবর্ষে কম্যুনিজম কেন গৃহীত হবে না তার অনেকগুলি কারণ আছে। ভারতবর্ষের আন্দোলন মূলতঃ একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—ভারতবর্ষের জনগণের জাতীয় মুক্তির জন্য আন্দোলন। তাঁর মতে ভারতবর্ষের কর্তব্য হবে 'সমন্বয় সাধনের একটি মতবাদ' গড়ে তোলা, যার ওপর ভবিষ্যৎ ভারতীয় সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হবে। এই মতবাদকে তিনি বলতেন 'সাম্যবাদ'—এটি একটি প্রাচীন ভারতীয় বাক্য যার মানে সামাজিক সব দ্বন্দ্ব দূর করে সর্বব্যাপী সমন্বয়ের সৃষ্টি করা।

১৯৩৫ সালে রোগগ্রস্ত পিত্তকোষ কেটে বার করে দেবার জন্য সুভাষচন্দ্রকে একটি বড় অপারেশন করাতে হয়েছিল। তাঁর চিকিৎসকেরা শেষ পর্যন্ত তাঁর অসুস্থতার মূল কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন। তখনকার দিনে বর্তমানের তুলনায় বড় অপারেশনে বিপদ ছিল অনেক বেশী। তার ওপর আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে প্রবাসে তিনি এই ঝুঁকি নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। যদি কোন অঘটন ঘটে এই জন্য তাঁকে তাঁর শেষ ইচ্ছা বা বার্তা লিখে দিতে বলা হলে তিনি একটি ছোট কাগজে লিখে দিয়েছিলেন—'দেশবাসীর জন্য রইল আমার ভালবাসা ও যা কিছু সম্পদ, আমার দেনা রইল আমার মেজদাদার জন্য।

ইয়োরোপ ভ্রমণের সময় সুভাষচন্দ্র সুইজারল্যাণ্ডেও গিয়েছিলেন। তাঁর দেশের এবং স্বাধীনতায় তাঁর অধিকার দাবী করতে তিনি

জেনেভায় লীগ অব্ নেশন্‌সে প্রাসাদের দোরে দোরে দরবার করেছিলেন। লীগের বিচারে ন্যায়ের চেয়ে আসুরিক শক্তিই বড় এবং পরাধীন জাতির কণ্ঠ শোনবার মত কেউ নেই দেখে তিনি অত্যন্ত হতাশ হয়েছিলেন।

ইয়োরোপে সুভাষচন্দ্র যেসব বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট ফরাসী পণ্ডিত এবং ভারত বন্ধু রোমেঁ রোলাঁ। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হবার পর রোলাঁ তাঁর ডায়েরীতে সুদূরের ভুলে যাওয়া এক দেশের এক অজ্ঞাত তরুণ পর্যটক সম্বন্ধে কিছু চিত্তাকর্ষক কথা লিখে রেখেছিলেন। রোলাঁ দেখেছিলেন যে সুভাষ খুবই ভাবগম্ভীর, নিবিষ্টচিত্ত এবং বুদ্ধিমান—তিনি সম্প্রতি যে বইটি প্রকাশ করেছেন, তাতেই তিনি তা প্রমাণ করেছেন। তিনি একজন সত্যিকারের রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টি দিয়ে এবং উল্লেখযোগ্য বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সব ঘটনাবলী এবং মানুষদের বিচার করেছেন ······সন্ত্রাসবাদকে তিনি স্বাস্থ্যকর নীতি বলে মনে করেন না এবং তিনি সংগঠিত প্রতিরোধের পক্ষে, সশস্ত্র সংগ্রাম বাদ দিয়ে নয় ( যদি সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তার পক্ষে )। লোক-দেখানো সরলতা অগ্রাহ্য করে তিনি এই আশা গোপন করেননি যে ইয়োরোপীয় যুদ্ধে ইংলণ্ডকে ব্যস্ত রাখবে, ভারতবর্ষের জয়লাভের সুযোগ সুনিশ্চিত করবে······সোভিয়েট রাশিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা অর্জনে যদি সাহায্য করে তাতে নিশ্চয়ই তিনি দোষের কিছু দেখবেন না ·····'।

## ১৯

১৯৩৬ সালের গোড়ায় সুভাষচন্দ্র মনে করলেন যে তাঁর স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং ঠিক করলেন যে তিনি দেশে ফিরে আসবেন। জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কয়েকমাস পরে লক্ষ্মৌয়ে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ

যখন তাঁর এই ইচ্ছার কথা জানতে পারলেন তারা ভিয়েনার ব্রিটিশ কনসালের মাধ্যমে তাঁকে একটি লিখিত সতর্কবাণী পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন যে তিনি যদি ভারতে ফিরে আসেন, তাহলে তিনি মুক্ত থাকবেন এ আশা যেন না করেন। এই সতর্কবাণী গ্রাহ্য না করে সুভাষচন্দ্র দেশে ফেরার জন্য রওনা হলেন। বোম্বাই-এ ভারতের মাটিতে পা দেওয়া মাত্র তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল এবং কারাগারে পাঠান হল। কিছু দিন পরে তাঁকে দার্জিলিং এর কাছে কার্সিয়ং-এ স্থানান্তরিত করে তাঁর মেজদাদা শরৎচন্দ্রের বাঙ্গলোতে অন্তরীণ রাখা হল। আগে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় এই বাড়ীটিই শরৎচন্দ্রের নিজের জন্য বন্দীশিবির হিসাবে কাজে লাগান হয়েছিল, সুতরাং সে নজির ছিল।

বর্তমান লেখক, তখন একজন ছাত্র, সরকারের বিশেষ অনুমতি নিয়ে কার্সিয়ং-এ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ কাটাবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সময় তিনি প্রথম খুব কাছে থেকে কেবল সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলিই নয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহুবিধ প্রশ্নে তাঁর মতামতও জানতে পেরেছিলেন। সুভাষচন্দ্র সেই সময়ের মধ্যে যে ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের প্রবেশপথে পৌঁছে গিয়েছিলেন, তা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল।

তাঁর আগের কারাবাসের সময় যেমন হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের আবার অবনতি ঘটল। বছরের শেষদিকে তাঁকে কলিকাতায় এনে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করে তাঁর অসুস্থতার পুনরাবৃত্তির কারণ নির্ণয় করার জন্য পরপর অনেকগুলি ডাক্তারী পরীক্ষা করা হল। ভারত সরকারের ১৯৩৫ এর নতুন আইন অনুযায়ী নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং নির্বাচনের পরে রাজনৈতিক জগতে যে বিরাট পরিবর্তন আসবে তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে না পারার জন্য তিনি খুব চঞ্চল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর মেজদাদা শরৎচন্দ্রের ওপর বাঙ্গলা কংগ্রেসের নেতৃত্বের পদ এবং পার্টির পক্ষে নির্বাচনী অভিযান চালাবার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল;

তিনি একবছর আগে কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন।

সারা দেশে ব্যাপকভাবে সুভাষচন্দ্রের প্রতি সরকারের প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরণের নিন্দা করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি আদালতে প্রমাণ করবার জন্য সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিরোধীপক্ষ যে মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, তা গৃহীত হয়েছিল। তাঁকে একটানা আটক রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য মে মাসে সর্ব-ভারতীয় হরতাল প্রতিপালিত হয়। কিন্তু বিদেশী সরকারের ওপর তার কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। প্রায় এক বছর পরে ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে স্বাস্থ্যের কারণে সুভাষচন্দ্রকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হল। তাঁর আজীবন বন্ধু দিলীপ কুমার রায় তার কিছুদিন পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা করার পর বলেছিলেন যে সুভাষচন্দ্রকে তাঁর মনে হয়েছিল 'তাঁর চোখের চারধারে ছায়ার বলয় থাকা সত্ত্বেও আগের তুলনায় অনেক বেশী আধ্যাত্মিক। তাঁর চোখ দুটি দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, আটবছর আগে যা ছিল না।'

মুক্তিলাভের পর কলিকাতায় সুভাষচন্দ্রকে বিরাট সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর শরীর মোটেই ভাল ছিল না। সুতরাং ডাক্তারের পরামর্শে তিনি ডাঃ ও শ্রীমতী ধরমবীরের অতিথি হিসাবে উত্তরভারতের স্বাস্থ্য নিবাস ডালহৌসীতে কয়েকমাস কাটিয়েছিলেন। তিনি যখন ছাত্র ছিলেন, সেই সময়ে এঁদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পরিচয় হয়। ধরমবীররা সুভাষের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁরা তাঁর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে দেবার ভার নিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল এবং ব্রিটিশ ভারতের এগারটির মধ্যে ছ'টি প্রদেশে কংগ্রেস দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে জয়-লাভ করল। বাঙ্গলা এবং আসামের মত প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে কংগ্রেস বেরিয়ে এল। বাঙ্গলায় সুভাষচন্দ্রের মেজদাদা শরৎচন্দ্র ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হলেন। বসু ভ্রাতৃদ্বয় ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা পার্টির

সঙ্গে মৈত্রী বন্ধন করতে চেয়েছিলেন—তাঁদের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম লীগকে কোণঠাসা করে দেবার জন্য। কিন্তু কংগ্রেস হাইকমাণ্ড কোয়ালিশন সরকার সমর্থন না করায় শরৎ-সুভাষের পরিকল্পনা কার্যকর হল না।

১৯৩৭ সালের শেষে যখন নিখিল ভারত কংগ্রেসের কমিটি বসল তখন খুব জোর গুজব যে ১৯৩৮ সালের গোড়ায় গুজরাটের হরিপুরায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হবে তাতে সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতি নির্বাচিত হবেন। সুভাষচন্দ্র ঠিক করলেন যে অল্পদিনের জন্য ইয়োরোপে ঘুরে আসবেন—প্রথমতঃ স্বাস্থ্যের জন্য, আর দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেস সভাপতির গুরুভার নেবার আগে ইয়োরোপীয় পরিস্থিতির সরেজমিন পরীক্ষা করতে। প্রথমে তিনি অষ্ট্রিয়ায় গিয়ে তাঁর প্রিয় জায়গা বাদগেষ্টাইনে অল্পদিন বিশ্রাম এবং পরিবর্তনের জন্য রইলেন। এইখানেই দশদিনে তিনি তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী 'এ্যন্ ইণ্ডিয়ান পিলগ্রিম' লিখে ফেললেন। একটি ইংরাজ প্রকাশক সংস্থার সঙ্গে চুক্তির আংশিক পূরণ হিসাবে এটি করেছিলেন। ১৯২১ সালে ইংলণ্ডে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে তাঁর পদত্যাগ পর্যন্ত তাঁর জীবন বৃত্তান্ত দশটি অধ্যায়ে তিনি লিখেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে জনজীবনে ঝাঁপিয়ে পড়ে অতিব্যস্ত ও অস্থির জীবন যাত্রার মধ্যে তারপর তিনি তাঁর আত্মজীবনী আর শেষ করতে পারেন নি। দেশে ফেরার আগে ১৯৩৮-এর জানুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্র লণ্ডনে গিয়েছিলেন। তিনি যখন সেখানে ছিলেন তখন কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তাঁর আনুষ্ঠানিক নির্বাচন হল। সুভাষচন্দ্র অবশ্য কালক্ষেপ না করে ইংলণ্ডেই স্পষ্ট ঘোষণা করলেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবাসীরা নিজেদের শক্তির ওপরই প্রধানতঃ নির্ভর করবে, সেই দেশের স্বকথিত বন্ধুদের বদান্যতার ওপর নয়। লণ্ডনে আয়ার্ল্যাণ্ডের ইমন ডি ভ্যালেরার সঙ্গে তাঁর দুটি সাক্ষাৎকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল; ডি ভ্যালেরা সেই সময় আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের পক্ষে ইংরাজদের সঙ্গে কতকগুলি জটিল সমস্যা নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছিলেন। এই সময় সুভাষচন্দ্র বসুর

সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের পর ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান লিখল—'যে সব ইংরাজ এই প্রথমবার বসুর সঙ্গে সাক্ষাত পেলেন, তাঁরা তাঁর শান্ত, ভদ্র আচরণে এবং ভারতবর্ষের ব্যাপারে দৃঢ় অথচ স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন মতামত শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন।'

লণ্ডনে ব্রিটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির আর, পামি দত্তর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে সুভাষ জাতীয় সংগ্রামের পরবর্তী পর্যায়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে পরবর্তী পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান গতিতে গণচেতনা বাড়বে। কংগ্রেসের কাজ হবে সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ঠিক পথে চালিত করে 'একটি ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ক্ষেত্রে পার্টি সংগঠন গড়ে তোলা'। তিনি আরও খোলাখুলিভাবে বলেছিলেন যে তিনি চান শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনগুলিকে সমবেতভাবে অন্তর্ভুক্ত করে এক ব্যাপক জাতীয় ফ্রন্ট হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসের গণভিত্তিকে আরও বিস্তৃত করতে। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন যে আমরা ভারতবর্ষে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা চাই এবং তা লাভ করে আমরা সমাজবাদের দিকে এগিয়ে যেতে চাই। তাই তিনি তাঁর ব্যক্তিগত মতের পুনরাবৃত্তি করে বলেছিলেন যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্ট হিসাবে সংগঠিত করা উচিত এবং তার লক্ষ্য হওয়া উচিত দ্বিমুখী—রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন এবং সমাজবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে সুভাষচন্দ্র ভারতে ফিরে এলেন। কলিকাতায় তাঁকে বিরাট সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তাঁর নির্বাচন বাঙ্গলার রাজনৈতিক মেজাজ ও আবহাওয়া বদলে দিয়েছিল এবং এই সমস্যা-জর্জরিত প্রদেশের জাতীয়তাবাদী মতাবলম্বী ও গোষ্ঠীর সকলেই এগিয়ে যাবার জন্য এক নতুন শক্তি অর্জন করেছিল। ১৯২২ সালে গয়ায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পর বাঙ্গলা থেকে আর কেউই সভাপতি নির্বাচিত হননি। হরিপুরার অধিবেশনটি ছিল কংগ্রেসের ৫১তম বার্ষিক অধিবেশন।

গ্রামাঞ্চলে বার্ষিক অধিবেশনগুলি করার নীতির নিজস্ব একটি গুরুত্ব ছিল। এইভাবে দলের নেতাদের ও কর্মীদের ভারতবর্ষের দরিদ্র ও অবহেলিত জনসাধারণের মুখোমুখি নিয়ে আসা হত।

সুভাষচন্দ্রের সামনে বড় কাজ ছিল কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণটি লিখে ফেলা। তিনি এটি করলেন একেবারে শেষ মুহূর্তে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য সাবলীলতার সঙ্গে এবং একটি খসড়ার ভিত্তিতে। এলগিন রোডে তাঁর পৈতৃক বাড়ীতে শোবার ঘরে বসে তিনি পাতার পর পাতা লিখলেন। জনৈক বার্তাবহ কাছেই উডবার্ণ পার্কে তাঁর মেজদাদার বাড়ীতে লেখা পাতাগুলি দৌড়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে লাগল। সেখানে দাদা শরৎচন্দ্রের সচিবের দফতরে সেগুলি টাইপ করে ফেলা হল এবং তৎক্ষণাৎ ছাপাখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। নির্বাচিত-সভাপতি যখন তাঁর এবং পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে হরিপুরা রওনা হলেন, অভিভাষণটির ছাপা তখনও শেষ হয়নি। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে বিলি করার জন্য যাতে সেগুলি সময়মত পৌঁছয়, সেজন্য সেগুলি পরের দিন পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

## ২০

১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট হরিপুরা গ্রামে পৌঁছলে সুভাষচন্দ্রকে খুব ঐতিহ্যপূর্ণ সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। ৫১টি সাদা জোড়া বলদে-টানা একটি রথে তাঁকে সভাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়, সঙ্গে বাজছিল বাদ্যবৃন্দ ব্যাণ্ড, আর সারা রাস্তায় হাজার হাজার গ্রামের মানুষ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। সব জাতীয় নেতাদের উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি—তখন কংগ্রেস সভাপতিকে তাই বলা হত—রোমাঞ্চকর ঘোষণা করলেন—'পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা ভারতবর্ষকে আর পরাধীন রাখতে পারে।'

বিরাট সভাপতির ভাষণে, যা ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে অতি

মূল্যবান দলিল হিসাবে ইতিহাসে থাকবে, সুভাষচন্দ্র প্রথমে মানুষের ইতিহাসের বিরাট দৃশ্যপটের বর্ণনা দিয়ে বিশেষ করে সাম্রাজ্যগুলির উত্থানপতনের উল্লেখ করেছিলেন এবং সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত বৈপরীত্যের কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অসামঞ্জস্যগুলি নিজস্ব চাপে অনিবার্যভাবে তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে একথাও মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যা লেনিন অনেকদিন আগেই বলেছিলেন যে কতকগুলি জাতিকে পরাধীন করে রাখার ফলে ব্রিটেনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি মজবুত হয়েছে। এটি পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে সুভাষচন্দ্র জোরের সঙ্গেই একথা বলতে চেয়েছিলেন যে সর্বোপরি ভারতের জনগণের ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হল—তার নিজের স্বার্থে, এতগুলি পরাধীন জাতির স্বার্থে এবং ব্রিটেনের নিজের স্বার্থেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করার জন্য সংগ্রাম করা।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'বিভাজন ও শাসন' এর নীতি, যা তারা সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে, সুসংবদ্ধভাবে এবং নির্মমভাবে চালিয়ে যাচ্ছে, তার প্রতি সভাপতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষে যে নতুন ভারতীয় সংবিধান প্রচলন করেছিল তাতে ঐ একই বিভাজনের নীতি ছিল—তাও তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলিকে যে কেবল বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা হয়েছিল তাই নয়, স্বৈরতন্ত্রী দেশীয় রাজপ্রতিনিধিদের এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পাশাপাশি রেখে 'বিভাজন ও শাসন' নীতি চিরস্থায়ী করার চেষ্টাও করা হয়েছিল। তিনি দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে যদি ঐ সংবিধান প্রত্যাখানও করা হয় 'কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ইংরাজ ভারতবর্ষকে বিভক্ত করার জন্য অন্য কোন পথ খুঁজবে এবং যে কোন উপায়ে ভারতবর্ষের জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বানচাল করে দেবে'।

সুভাষচন্দ্র এই কথা বলে আশার সঞ্চার করেছিলেন যে সেই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বেশ কতকগুলি দেশে, যেমন, আয়ার্ল্যাণ্ডে,

ভারতবর্ষে, প্যালেষ্টাইনে, ইজিপ্টে ও ইরাকে অসুবিধায় পড়েছিল। সাম্রাজ্যের বাইরে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ইটালীর কাছ থেকে এবং দূর প্রাচ্যে জাপানের কাছ থেকেও চাপ আসছিল। সর্বোপরি ছিল সোভিয়েট রাশিয়া, যার অস্তিত্বই সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণীর মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করত। তার ওপর ব্রিটেনের আর সারা বিশ্বের সমুদ্রের উপর কর্তৃত্ব ছিল না। পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন একটি আবিষ্কার—বিমান বাহিনীর আবির্ভাব সাম্রাজ্যের কাছে নতুন এক চ্যালেঞ্জ রূপে দেখা দিয়েছিল। রাষ্ট্রপতি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে পৃথিবীর শক্তিগুলির পরস্পরের ওপর এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষ অনেক বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, যা সে আগে কখনও ছিল না।

ভারতবর্ষের ঐক্য প্রসঙ্গে সুভাষ বলেছিলেন যে জাতীয়তাবাদের মৌলিক নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এই সমস্যার শেষ সমাধানের এই হল উপযুক্ত সময়। 'নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচতে দাও' কংগ্রেসের এই নীতি—বিভিন্ন ভাষাগত অঞ্চলের বিবেকবোধ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকারে একেবারে হস্তক্ষেপ না করার নীতিরই তিনি পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

স্বাধীনতা অর্জনে জাতীয় সংগ্রামে কংগ্রেসের রীতি সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন যে তা হবে ব্যাপকতম অর্থে সত্যাগ্রহ বা আইন অমান্য সহ অহিংস অসহযোগ। আমাদের পথ যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের একথা তিনি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর কাছে সত্যাগ্রহ কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নয়, সক্রিয় প্রতিরোধও বটে। আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে কংগ্রেসের ভূমিকা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের ছায়া না রেখে তাঁর চিন্তাধারা তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, যে দল ভারতবর্ষের জন্য স্বাধীনতা অর্জন করবে, সেই দলই যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের সমগ্র কার্যসূচী রূপায়িত করবে। তিনি এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে কংগ্রেস দলের গণতান্ত্রিক ভিত্তি ভবিষ্যৎ ভারতকে

স্বৈরতন্ত্র থেকে রক্ষা করবে এবং এটাও নিশ্চিত করবে যে ওপর থেকে জনগণের ওপর নেতাদের চাপিয়ে দেওয়া হবে না নীচের থেকে নির্বাচিত হবে।

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও রোগ দূরীকরণে এবং বৈজ্ঞানিক উৎপাদন ও বন্টন প্রভৃতি প্রধান জাতীয় সমস্যাগুলি কেবল সমাজবাদী ধারায় সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করার চেষ্টা করা যেতে পারে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে আমাদের জাতীয় সরকারকে সবচেয়ে আগে যা করতে হবে তা হল একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন। পরিকল্পনার একটি স্বল্পমেয়াদী এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী কার্যসূচী থাকবে। প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে থাকবে, প্রথম আত্মত্যাগের জন্য দেশকে প্রস্তুত করা, দ্বিতীয় ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করা, এবং তৃতীয় স্থানীয় এবং সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম করা। সম্ভাব্য কোন বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করতে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে জাতিকে উপরোক্ত ভিত্তির ওপর ঐক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলেছিলেন যে সাংস্কৃতিক এবং প্রশাসনের ব্যাপারে সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও প্রদেশগুলিকে অনেকাংশে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট রাখতে হবে। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন যে জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে রোমান লিপিতে হিন্দুস্তানী ভাষা গড়ে তুলতে হবে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি যথা, এরোপ্লেন, টেলিফোন, রেডিও, ফিল্ম, টেলিভিশন ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশকে নিকটতর করতে হবে। স্বাধীন ভারতবর্ষের দীর্ঘমেয়াদী কার্যসূচী সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন যে প্রথম সমস্যা হবে আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সামলান, কারণ আমরা আমাদের জনসংখ্যা এত দ্রুত বাড়তে দিতে পারি না।

পুনর্গঠন সম্বন্ধে প্রধান সমস্যা হবে দারিদ্র্য দূর করা। তিনি বলেছিলেন যে তা করতে হলে চাই আমাদের জমি প্রথার আমূল

সংস্কার, কৃষি ঋণ মকুব, গ্রামের জনগণের জন্য সহজ ঋণের ব্যবস্থা, সমবায় আন্দোলন বাড়ান এবং কৃষির আধুনিকীকরণ।

তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে কৃষির উন্নতিই যথেষ্ট হবে না। রাষ্ট্রের মালিকানায় এবং নিয়ন্ত্রণে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি অপরিহার্য হবে এবং একটি নতুন শিল্পের কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। পরিকল্পনা কমিশনের কাজ হবে আমাদের জনগণের স্বার্থে দেশের শিল্পবাণিজ্যের—বৃহৎ, মাঝারী এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সমন্বয়পূর্ণ উন্নতি কার্যকর করা। সবশেষে উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে আমাদের সমগ্র কৃষি এবং শিল্প পদ্ধতিকে ক্রমশঃ সামন্ততান্ত্রিক করার একটি ব্যাপক পরিকল্পনা অবশ্যই প্রয়োজন।

সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বের সময় কংগ্রেস দল ব্রিটিশ ভারতে এগারটির মধ্যে সাতটি প্রদেশে শাসনের ভার গ্রহণ করেছিল। সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন যে আমাদের মন্ত্রীদের প্রথম কাজ হবে আমলাতন্ত্রের গঠন ও চরিত্র বদলান যাতে আমাদের নীতি ও আদর্শ কাজে রূপায়িত করা যায়। দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী কংগ্রেস মন্ত্রীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জলসেচ, ভূমি সংস্কার, শিল্প, শ্রমিক কল্যাণ, মদ্যপান নিরোধ, কারা সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে পুনর্গঠনের পরিকল্পনাগুলি সম্পাদন করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেছিলেন যে তাঁর বিচারে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কেবল জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী পরিচালক তাই নয়, স্বাধীন ভারতবর্ষের ছায়া মন্ত্রিসভাও বটে। সুভাষচন্দ্র ইংরেজের তৈরী সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় বাধা দেওয়ার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন, কারণ ঐ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছিল ভারতবর্ষকে রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করার জন্য। সুভাষচন্দ্রের মত ছিল ইংরাজ মডেলের যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আপ্রাণ লড়াই করতে হবে—কেবল সাংবিধানিক ধারায়ই নয়, যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ব্রিটিশ-ভারতে এবং দেশীয় রাজ্যগুলিতে গণ-আইন অমান্য সহ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে।

হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটের পর্যালোচনা করে কংগ্রেস দলের সংগঠন সম্বন্ধে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম প্রস্তাব ছিল যে অভূতপূর্ব গণ-শক্তিকে সুসংহত করে ঠিক পথে চালিত করার জন্য কংগ্রেসের একটি সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী অবশ্যই প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেছিলেন যে স্বাধীনতার পর জাতির পুনর্গঠনের কাজ হাতে নেওয়ার জন্য কর্মচারী বাহিনীর দরকার। অর্থাৎ ভবিষ্যতের উঠতি-নেতাদের প্রশিক্ষণের জন্য কংগ্রেসকে ব্যবস্থা করতে হবে। তৃতীয়তঃ তাঁর মতে ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষক সংস্থাগুলিকে গণ-সংগ্রামের প্রধান মাধ্যম কংগ্রেসের আদর্শ এবং নীতিতে অনুপ্রাণিত করা এবং তাদের সামগ্রিকভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে সংযুক্তি ঘটিয়ে জাতীয় আন্দোলনের প্রধান ধারার মধ্যে টেনে আনা আমাদের কর্তব্য। এর দ্বারা একটি বিরাট সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্ট গঠনের পথ প্রস্তুত হবে। চতুর্থতঃ সুভাষচন্দ্র এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে কংগ্রেসের বাম-পন্থীদের একটি ব্লকে মিলিত হওয়া উচিত—তবে এটা পরিষ্কার বোঝা চাই যে বামপন্থী ব্লক অবশ্যই চরিত্রগত দিক দিয়ে সমাজবাদী হবে। পঞ্চমতঃ তিনি আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এবং ভারতবর্ষের জন্য একটি স্বাধীন বৈদেশিক নীতি গড়ে তোলার জন্য জোরালো সওয়াল করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর প্রথম প্রস্তাব ছিল যে বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে কোন দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি বা তার রাষ্ট্রের গঠন দ্বারা আমাদের প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হলে ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রয়োজন এবং বিদেশে ভারতীয় ছাত্ররা এই কাজে বিশেষ সাহায্য করতে পারে। সারা পৃথিবীতে ভারতবর্ষকে জানাবার জন্য সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক যোগাযোগ আর একটি প্রধান উপায়। সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব করেছিলেন যে ভারতীয় জাতীয়

কংগ্রেসের উচিত ইয়োরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় বিশ্বস্ত ও অনুমোদিত প্রতিনিধি নিয়োগ করা। তিনি আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলি যথা পারস্য, আফগানিস্থান, নেপাল, চীন, বর্মা, শ্যাম, মালয় রাষ্ট্রগুলি, ইষ্ট ইণ্ডিজ এবং সিংহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা এবং বাঞ্ছনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন।

অভিভাষণের উপসংহারে সুভাষচন্দ্র সকলের প্রতি ঐকান্তিক আবেদন করেছিলেন কংগ্রেসের পতাকাতলে সমগ্র দেশকে একত্রিত করতে—কংগ্রেসের দক্ষিণ বা বাম ব্লক থাকতে পারে, কিন্তু কংগ্রেস ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য সচেষ্ট সব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগঠনগুলির সাধারণ মঞ্চ। বিশেষ করে বামপন্থী গোষ্ঠীর কাছে তিনি বিশেষভাবে আবেদন করেছিলেন কংগ্রেসের গণতন্ত্রীকরণের জন্য তাঁদের সমস্ত শক্তি ও সংগতি নিয়োগ করতে। তাঁর ভাষণের শেষ কথাগুলি ছিল ঃ 'আমাদের সংগ্রাম কেবল ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়, বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও বটে, ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ যার মূল ভিত্তি। সুতরাং আমরা শুধু ভারতবর্ষের জন্য নয়, সমগ্র মানবসমাজের জন্যও সংগ্রাম করছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অর্থ মানবসমাজের মুক্তি।

কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র সারা দেশে ব্যাপকভাবে সফর করেছিলেন। তাঁর প্রচারের প্রধান ধুয়া ছিল কংগ্রেসকে অবশ্যই চূড়ান্তভাবে এবং অনমনীয়ভাবে ইংরাজদের সঙ্গে কোনরকম আপোষের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে এবং ভারতের জনগণকে ইয়োরোপে আসন্ন যুদ্ধ সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট এক জাতীয় গণ-সংগ্রাম সুরু করার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। দলের প্রধান হিসাবে তিনি কংগ্রেসের এবং ওয়ার্কিং কমিটির সভাগুলিতে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীনভাবে এবং সকলের প্রতি সমান সহৃদয়তার সঙ্গে সভাপতিত্ব করতেন। তিনি দক্ষতার সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রিসভায় একটি সঙ্কটের সমাধান করেছিলেন। আসামে তাঁর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে মুসলিম লীগ সরকার অপসারিত হয় এবং সেখানে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৯৩৮

সালের শেষার্ধে জটিল হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের সমাধানের একটি সূত্র বের করতে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে পরপর কয়েকবার মিলিত হয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে অনেক চিঠিপত্রও আদানপ্রদান করেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় মুসলিমদের একমাত্র কর্তৃত্বপূর্ণ ও প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে মুসলিম লীগকে স্বীকৃতি দিতে হবে—জিন্নার এই অনড় দাবীর জন্য আলোচনা ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে ১৯৩৯ সালে বাঙ্গলায় কলিকাতা কর্পোরেশনে সুভাষচন্দ্র ধৈর্যের সঙ্গে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এবং বাস্তবধর্মী কূটনীতির সাহায্যে মুসলিম লীগের সঙ্গে একটি বোঝাপড়ায় আসতে পেরেছিলেন—যাকে 'বসু-লীগ প্যাক্ট' বলা হত। হরিপুরা অধিবেশনের তিন মাসের মধ্যে দিল্লীতে তিনি কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। পরে শিল্পমন্ত্রীদের আর একটি সম্মেলনও করেছিলেন—সেখানে তিনি ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশকে অর্থনীতিতে ও শিল্পে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে জাতীয় পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা করেছিলেন। ১৯৩৮ সালের মাঝামাঝি কংগ্রেসের সমর্থনে তিনি একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করবেন স্থির করেন এবং এই বিষয়ে তিনি প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিবিদ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনা চালান। তিনি এই কমিটির চেয়ারম্যান হবার জন্য জওহরলাল নেহরুকে আমন্ত্রণ জানান। সভাপতির এই প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অনুমোদন করে এবং ১৯৩৮এর ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইতে পরিকল্পনা কমিটির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

জাতীয় পুনর্গঠন সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের খুব স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট মতামত ছিল এবং তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন যে ভারতবর্ষে শিল্পের কোন অগ্রগতি সম্ভব নয় যতদিন পর্যন্ত না আমরা শিল্প বিপ্লবের ঝুঁকি নিই। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে এই বিষয়ে সব কংগ্রেসীরাই একরকম

মত পোষণ করেন না। কিন্তু তিনটি প্রধান কারণে নতুন প্রজন্ম শিল্পায়নের পক্ষে। প্রথম, বেকার সমস্যা সমাধানে শিল্পায়ন প্রয়োজন। যদিও বৈজ্ঞানিক কৃষি ব্যবস্থায় জমির উৎপাদন বাড়বে, তাহলেও ভারতবর্ষের প্রতিটি নরনারীকে খাদ্য দিতে হলে জনসংখ্যার একটি বড় অংশকে জমি থেকে শিল্পের দিকে নিয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয়তঃ নতুন প্রজন্ম জাতীয় পুনর্গঠনের ভিত্তি হিসাবে সমাজবাদ সমর্থন করে এবং সমাজবাদ শিল্পায়নকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। পরিশেষে, বিদেশী শিল্পের সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হলে শিল্পায়ন প্রয়োজন।

সুভাষচন্দ্র বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন যে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে কংগ্রেসীদের তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হতে হবে। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষ তুরস্কের পথ অনুসরণ করুক, চীনের নয়। তিনি বলেছিলেন যে জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি গড়ে তুলতে অনেক কিছুর প্রয়োজন, যথা, একটি রাষ্ট্রভাষা, একরকম পোষাক, খাদ্য ইত্যাদি ; কিন্তু তাঁর মতে সবচেয়ে বেশী যা প্রয়োজন তা হল একজাতি হবার এবং একজাতি হয়ে থাকবার প্রবল ইচ্ছাশক্তি। তাই তাঁর ধারণা, ঐক্যের সমস্যা মূলতঃ গণ মনস্তত্ত্বের সমস্যা। জনগণকে শেখাতে এবং অনুভব করাতে হবে যে তারা একজাতি। এই জাতীয় ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে আরও যা চাই তা হল একটি সর্বভারতীয় দল। সেই দল হল কংগ্রেস। আমাদেরই স্থির করতে হবে যে আমাদের শিল্পায়ন তুলনামূলকভাবে ব্রিটেনের মত নিয়মিত ও মন্থর হবে, না সোভিয়েট রাশিয়ার মত জোরকদমে হবে। তাঁর মতে ভারতবর্ষে শিল্পায়ন জোর কদমে হওয়া চাই। তিনি বলেছিলেন, যখন আমাদের নিজেদের জাতীয় সরকার হবে, তখন আমাদের প্রথম কর্তব্য হবে সারা দেশের জন্য একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন নিযুক্ত করা।

সুভাষচন্দ্র পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন যে যখন তিনি শিল্পায়নের পক্ষে বলছেন তখন তিনি কুটিরশিল্প বাদ দিচ্ছেন না। প্রকৃতপক্ষে,

জার্মানী, জাপান এবং অন্যান্য উন্নত দেশগুলির মত বিজ্ঞানের সাহায্যে কুটিরশিল্পের পুনরুদ্ধার ও সেগুলি শক্তিশালী করা তিনি সমর্থন করেন।

জাতীয় পরিকল্পনার জন্য তিনি নিম্নলিখিত নীতিগুলি উপস্থাপিত করেছিলেনঃ প্রথম, শিল্পের দিক থেকে আমরা যাতে আমাদের প্রয়োজনীয় মূল দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর হতে পারি সেটাই হবে ভারতবর্ষের লক্ষ্য। দ্বিতীয় আমাদের নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রধানতঃ মূল শিল্পগুলি, যথা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, ধাতু উৎপাদন, মেসিন ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ, অপরিহার্য রসায়ন উৎপাদন, যানবাহন ও যোগাযোগ শিল্প প্রভৃতির বৃদ্ধি ও ক্রমোন্নতি। তৃতীয়, প্রযুক্তি বিদ্যা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের ছাত্রদের, যদি প্রয়োজন হয়, একটি পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মত শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে পাঠান উচিত। তাঁর মত ছিল যে প্রযুক্তি গবেষণা যে কোন রকম সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। চতুর্থ, তিনি একটি স্থায়ী জাতীয় গবেষণা পর্ষদ গড়ে তোলা সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমাদের প্রয়োজন বিজ্ঞান এবং রাজনীতির মধ্যে একটি সুদূরপ্রসারী সমন্বয় সাধন।

## ২২

কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে কাজ করার সময় এবং সারা দেশে ব্যাপক সফর করে সুভাষচন্দ্র নেতৃত্বের স্তরে বিভিন্ন ভাবধারা এবং জাতীয় সংগ্রাম সম্বন্ধে জনগণের অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে নতুন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করেছিলেন। সভাপতি নিজেই ছিলেন ভারতের দৃঢ়চিত্ত আপোষবিরোধী জাতীয় বিপ্লবীদের প্রতিনিধিস্বরূপ, যাঁরা ঠিক সময়ে সাম্রাজ্যবাদের ওপর চরম ও প্রচণ্ড আঘাত হানবার এবং ক্ষমতা দখলের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। অন্যপক্ষে তিনি দেখছিলেন যে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব স্তরে এমন অনেকেই ছিলেন যাঁরা সংগ্রামে ক্লান্ত

হয়ে ইংরাজ সরকারের সঙ্গে আপোষের জন্য প্রস্তুত ছিলেন ; এমন কি ইংরাজরা যা আমাদের ওপর চাপাতে চাইছিলেন সেই অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার ভিত্তিতেও দরকষাকষি করতে প্রস্তুত ছিলেন। তৃতীয়তঃ, দক্ষিণ ও বাম উভয় দিকেই এমন সব তাত্বিক গোষ্ঠী ছিলেন যাঁরা ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সোজাসুজি সংগ্রামের চেয়ে দার্শনিক ও নিছক তাত্বিক রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে বিতর্কে বেশী আগ্রহী ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে সুভাষচন্দ্রের এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে তাঁর মত একজন আপোষবিরোধী জাতীয় বিপ্লবীর পরের বছরও কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে থাকা উচিত, যে সময় ইয়োরোপে যুদ্ধ বেধে যাবে বলে তিনি মনে করেছিলেন।

কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা দ্বিতীয় বারের জন্য সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি করতে না চাওয়ার তিনটি কারণ ছিল। প্রথম হল ব্রিটেনের সঙ্গে আপোষের বিরোধিতা আরও জোরদার করার জন্য তাঁর অবিরাম অভিযান। তিনি চেয়েছিলেন ইংরাজদের পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রের স্কীম সরাসরি প্রত্যাখ্যান এবং এ বিষয়ে কোনরকম দরকষাকষি না করা। দ্বিতীয়তঃ জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির নেতৃত্বে শিল্পায়ন এবং শিল্পোদ্যোগের পরিকল্পনার পক্ষে তাঁর প্রচার দক্ষিণপন্থী মতামতের বিরোধী ছিল। তৃতীয়তঃ ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন হিটলারের সঙ্গে ইংরাজরা অসৎ মিউনিক চুক্তি সম্পাদন করেছিল, তখন তিনি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন যে ইয়োরোপে যুদ্ধ অনিবার্য। কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তিনি ইয়োরোপীয় যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সংগ্রাম সুরু করার জন্য জনগণকে তৈরী করতে সারা ভারতে প্রকাশ্য প্রচার সুরু করেছিলেন। তাঁর এই কাজ জনগণ খুব পছন্দ করলেও দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব মোটেই পছন্দ করেন নি, কারণ তাঁরা মন্ত্রিসভার বা সংসদীয় কাজকর্মে কোনরকম অসুবিধা সৃষ্টি হোক তা চান নি। তাই তাঁর সভাপতিত্বের শেষদিকে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দক্ষিণপন্থীদের বিরোধ বেড়ে গিয়েছিল।

তিনি যখন ঘোষণা করলেন যে তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য

সভাপতির পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন স্থির করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তখনকার কংগ্রেস নেতৃত্বের বড় অংশই তার বিরোধিতা করল। সুভাষচন্দ্র জোর দিয়ে বলেছিলেন যে ঐ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন যে কংগ্রেসের মত গণতান্ত্রিক একটি গণসংগঠনে সভাপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত নীতি ও কার্যসূচীর ভিত্তিতে। যদি নরেন্দ্র দেবের মত আর একজন আপোষবিরোধী জাতীয় নেতা সভাপতি হিসাবে মনোনীত হন, তাহলে তিনি সরে দাঁড়াতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তা হবার ছিল না। মহাত্মা গান্ধীর আশীর্বাদ নিয়ে দক্ষিণপন্থীদের মনোনীত পট্টভি সীতারামায়াকে সুভাষচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড় করানো হল। নির্বাচনের আগে সুভাষচন্দ্রের ও দক্ষিণপন্থী নেতাদের মধ্যে নিজের নিজের পক্ষে যুক্তি দিয়ে সংবাদপত্রে উত্তপ্ত তর্কবিতর্ক প্রকাশিত হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দু'শোরও বেশি ভোটে জয়লাভ করলেন। নির্বাচিত হওয়াতেই প্রমাণ হয়েছিল সারা দেশে তাঁর কত সমর্থন ও প্রভাব ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সময় গান্ধীজী চুপচাপ ছিলেন; কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবার পর তিনি স্বীকার করেছিলেন যে সীতারামায়ার পরাজয় তাঁর নিজেরই পরাজয়। বোঝা যায় যে জওহরলাল নেহেরু ঘটনার প্রবাহে অসুখী ছিলেন এবং তিনি খানিকটা নিরপেক্ষ ছিলেন; কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মতে এই নিরপেক্ষতা ছিল বিরোধিতারই সামিল।

১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সুভাষচন্দ্র ওয়ার্ধায় গান্ধীজীর আশ্রমে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন, কিন্তু এই সাক্ষাতকার নিষ্ফল হল। কলিকাতায় ফিরে সুভাষচন্দ্র গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি ওয়ার্কিং কমিটির পরবর্তী সভা ঐ মাসের শেষাশেষি পর্যন্ত স্থগিত রাখবার প্রস্তাব রাখলেন। অধিকাংশ সদস্য তাঁর অনুরোধের জবাব দিলেন একযোগে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করে। জওহরলাল আলাদাভাবে একটি বিবৃতি দিলেন, যার অর্থ হল পদত্যাগ। ফলে ওয়ার্কিং কমিটিতে রইলেন শুধু অসুস্থ সভাপতি এবং তাঁর মেজদাদা

শরৎচন্দ্র বসু।

মার্চ মাসের গোড়ায় মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুরের কাছে ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন হবার ঠিক ছিল। সুভাষচন্দ্রের চিকিৎসকেরা তাঁর অধিবেশনে যোগদানের ঘোর বিরোধী ছিলেন; কারণ তাঁর দুটি ফুসফুসেই নিউমোনিয়া হয়েছিল এবং খুব তাড়াতাড়ি সেরে ওঠার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু নির্বাচিত সভাপতি স্থির করলেন যে ডাক্তারদের হুকুম অগ্রাহ্য করে তিনি ত্রিপুরী যাবেন। ট্রেনে ওঠাবার জন্য তাঁকে একটি এ্যম্বুলেন্সে ষ্টেশনে নিয়ে যাওয়া হল এবং জব্বলপুরে তাঁকে ষ্ট্রেচারে করে নামিয়ে আবার এ্যম্বুলেন্সে করে কংগ্রেস নগরে সভাপতির শিবিরে পৌঁছে দেওয়া হল। তাঁর পরিবারের লোকেরা এবং ডাক্তারদের একটি দল তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ত্রিপুরীতে তাঁর জ্বর কমবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তা সত্ত্বেও তিনি বিষয় নির্বাচনী কমিটির সভায় যোগদান করতে যাবার জন্য জিদ ধরলেন এবং মঞ্চে শুয়ে শুয়ে সভার কাজ পরিচালনা করলেন। অচল অবস্থা দূর করার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজিত রাজনৈতিক তৎপরতা এবং একটানা কষ্টসাধ্য আলাপ আলোচনা চলেছিল। কিন্তু পুরানো ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্য সভাপতির সঙ্গে কোনরকম আপোষ বা মীমাংসার ঘোর বিরোধী ছিলেন। পরামর্শের জন্য মহাত্মা গান্ধীকে কাছাকাছি পাওয়া যায়নি, কারণ তিনি রাজকোটে থাকবেন ঠিক করেছিলেন এবং সেখানে তিনি সম্পূর্ণ অন্য একটি রাজনৈতিক কারণে অনশন করছিলেন।

সভাপতি অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় প্রকাশ্য অধিবেশনে তাঁর অভিভাষণটি পাঠ করে দেন তাঁর দাদা শরৎচন্দ্র। সভাপতি তাঁর ভাষণের প্রথমেই যে অতি অসাধারণ ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে তার উল্লেখ করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অতিথি হিসাবে ইজিপ্টের ওয়াফ্‌ড্‌ দলের ভ্রাতৃপ্রতিম এক দল প্রতিনিধি ঐ অধিবেশনে যোগদান করছিলেন; তাঁদের তিনি স্বাগত সম্ভাষণ জানান। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বুঝিয়ে

বলেন-ইয়োরোপ এবং এশিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ইংরাজ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের শক্তি এবং মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে। আভ্যন্তরীণ রাজনীতি বিষয়ে তিনি পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজের প্রত্যয়ের কথা বলেছিলেন যে পূর্ণ স্বরাজের প্রশ্নটি তোলার এবং ইংরাজ সরকারকে আমাদের জাতীয় দাবী সম্বলিত একটি চরমপত্র দেবার সময় এসেছে। তিনি আরও বলেছিলেন যে যদি একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া যায় তাহলে আমাদের উচিত জাতীয় দাবী জোরদার করার জন্য সত্যাগ্রহ বা গণ আইন অমান্যর মত পথ অবলম্বন করা। তিনি তাঁর দেশবাসীকে ও দলকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে সেই সময় ইংরাজ সরকার বেশীদিন সর্বভারতীয় সত্যাগ্রহর মত কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে পারবে না। তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা যদি সব বিরোধ ভুলে আমাদের সব শক্তি সংহত করে জাতীয় সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি, তাহলে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের ওপর আমাদের আক্রমণ দুর্নিবার হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি দেশীয় রাজ্যগুলিতে অভূতপূর্ব জাগরণের প্রতি দেশবাসীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং ঐসব রাজ্যের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য জোর দিয়ে বলেছিলেন। উপসংহারে তিনি স্বরাজের দিকে শেষ অভিযানের জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। এই কাজে তিনি পার্টি থেকে দুর্নীতি এবং সব দুর্বলতা নির্দয়ভাবে দূর করাই শুধু নয়, কিষাণ এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠনগুলির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাও চেয়েছিলেন।

সভাপতির কথায় কেউ কর্ণপাত করলেন না। এমনকি তথাকথিত অনেক বামপন্থী গোষ্ঠীর ভীরু মনোভাব এবং দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হল যে কংগ্রেস কার্যনির্বাহীকে গান্ধীজীর সন্দেহাতীত বিশ্বাস অর্জন করতে হবে এবং তাই 'গান্ধীজীর ইচ্ছা অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি মনোনীত করতে' সভাপতিকে নির্দেশ দেওয়া হল। এইভাবে কংগ্রেস দক্ষিণপন্থীরা সভাপতি অন্য যা কিছু

বলেছিলেন তা অগ্রাহ্য করে, মহাত্মা গান্ধীর প্রতি আস্থা জ্ঞাপনই কংগ্রেসের সামনে প্রধান প্রশ্ন ও কর্তব্য বলে ধরে নিয়ে সভাপতির ক্ষমতা এমনভাবে সীমিত করল যে যতক্ষণ পর্যন্ত না মহাত্মা গান্ধী পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীনভাবে নতুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির গঠন সম্বন্ধে তাঁর ইচ্ছা জানাচ্ছেন, সভাপতি তাঁর কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারবেন না।

## ২৩

ত্রিপুরীতে সুভাষচন্দ্র যে তীব্র মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন, তাতে তাঁর শীঘ্র সুস্থ হয়ে ওঠা আরও শক্ত হল। তাঁর চিকিৎসকেরা এবং আত্মীয়স্বজন তাই স্থির করলেন যে তাঁকে কলিকাতায় ফিরিয়ে না নিয়ে গিয়ে বিশ্রাম ও রোগমুক্তির জন্য ধানবাদের কাছে অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থান জামাডোবায় কিছুদিন রাখবেন। কিছুদিন পরে তাঁর নিজের একটি লেখা থেকে এই বিশেষ সময়ে তাঁর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে বোঝা যায়। ত্রিপুরীতে নীতিবিগর্হিত এক অত্যন্ত বেদনাদায়ক পরিবেশের জন্য আমি রাজনীতিতে এমন অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা নিয়ে সেখান থেকে ফিরলাম যা গত উনিশ বছরের মধ্যে আমি কখনও অনুভব করিনি···আমি আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে আলোর জন্য প্রার্থনা করলাম। তারপর ধীরে ধীরে আমি এক নতুন আলো দেখতে পেলাম এবং আমি মানসিক ভারসাম্য এবং মানুষের ওপর আর আমার দেশবাসীর ওপর বিশ্বাস ফিরে পেতে লাগলাম। আর যাই হোক না কেন ত্রিপুরী ভারতবর্ষ নয়···ত্রিপুরীতে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা সত্ত্বেও মানুষের ওপর আমার মৌলিক বিশ্বাস হারাই কি করে? মানুষকে অবিশ্বাস করা মানে তার মধ্যের দেবত্বকে অস্বীকার করা···মানুষের মূল অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা।'

ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এমন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে সভাপতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যা মহাত্মা গান্ধীর

সন্দেহাতীত আস্থাভাজন হবে এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী গঠিত হবে; জামাডোবায় তাঁর রোগশয্যা থেকে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর সঙ্গে দীর্ঘ পত্রালাপ করেছিলেন। কংগ্রেসের উচ্চতম কমিটি বিভিন্ন মতাবলম্বী সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে না পুরোপুরি সমপ্রকৃতির হবে এই ছিল বিরোধের মূল কারণ। সভাপতির মতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে দলের মধ্যের প্রধান ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর ও শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব বজায় রেখে বিভিন্ন ভাবধারার প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কমিটি হওয়া উচিত যাতে কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধভাবে এবং দৃঢ় ভাবে ইংরাজ সরকারে সম্মুখীন হতে পারে। কিন্তু গান্ধীজী জোরের সঙ্গে বলছিলেন যে চরিত্রগতভাবে ওয়ার্কিং কমিটি সমপ্রকৃতির হওয়া উচিত, কেবল একই মতাবলম্বী এবং এক ভাবধারার সদস্যদের নিয়ে। তিনি সভাপতিকে নিজের পছন্দমত পরিষদ গঠন করতে পরামর্শ দিলেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্র অবশ্য তা করতে পারলেন না ; ঐ প্রস্তাবে পরিষ্কার বলা হয়েছিল যে গান্ধীজীর ইচ্ছা অনুযায়ী এবং সন্দেহাতীত ভাবে তাঁর আস্থাভাজন হবে এমন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হবে। জওহরলাল নেহরু এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ জামাডোবায় সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করলেন এবং অচল অবস্থার সমাধানের পথ বার করার জন্য তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন।

১৯৩৯ সালের এপ্রিলের শেষ দিকে কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা আহ্বান করা হল। এই সভার আগে কলিকাতার কাছে সোদপুরে মহাত্মা গান্ধী এবং সুভাষচন্দ্রের মধ্যে শেষপ্রস্থ সরাসরি আলোচনা হয়েছিল। জওহরলাল নেহরু এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদ উভয়েই এই আলোচনায় সাহায্য করেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কোন মীমাংসায় পৌঁছনো সম্ভব হয়নি। শেষে কমিটির প্রকাশ্য অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন। পদ-ত্যাগ করার সময় তিনি বলেছিলেন—'আমি পুনরায় অনুরোধ করব যে ত্রিপুরী কংগ্রেসে যে দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে অনুগ্রহ করে

মহাত্মাজী তা গ্রহণ করুন এবং ওয়ার্কিং কমিটি মনোনীত করুন। ···আমাদের পক্ষে বিশেষ দুর্ভাগ্য যে তিনি ওয়ার্কিং কমিটি মনোনীত করতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করছেন।···গভীর চিন্তার পর পুরোপুরি গঠনমূলক মনোভাব নিয়ে আমি আপনাদের হাতে আমার পদত্যাগপত্র দিচ্ছি।' এই পদত্যাগ সুভাষচন্দ্রের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি এবং ভারতবর্ষের মুক্তির সন্ধানে নতুন একটি অধ্যায়ের সূচনা চিহ্নিত করল।

তাঁর পদত্যাগের খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুভাষচন্দ্রের কাছে নিম্নলিখিত বার্তা পাঠিয়েছিলেন—'অত্যন্ত উত্যক্তকর পরিস্থিতির মধ্যে যে মর্যাদাবোধ ও ধৈর্যের পরিচয় তুমি দিয়েছ তাতে তোমার নেতৃত্বে আমার সপ্রশংস আস্থা অর্জন করেছে। বাঙ্গলাকে তার নিজের আত্মসম্মানের জন্য এবং তোমার আপাত পরাজয়কে স্থায়ী জয়ে পরিণত করায় সাহায্য করতে এই একই রকম নিখুঁত শালীনতা বজায় রাখতে হবে।' একথা এখন সকলেই জানেন যে কংগ্রেস সভাপতি পদে দ্বিতীয়বারের জন্য সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর মতে কংগ্রেসে দুজন 'আধুনিকতাবাদী' ছিলেন—জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু—জাতীয় স্বার্থে দেশের হাল তাঁদেরই ধরা উচিত। যেহেতু নেহরু ইতিমধ্যেই জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, সুভাষচন্দ্রেরই সভাপতি থাকা উচিত।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের আগে, অধিবেশনের সময় এবং পরে সুভাষচন্দ্রের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা থেকে তিনি বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ১৯৩৯ সালে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল কংগ্রেসে একটি সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল বামপন্থী ব্লক। কংগ্রেস সভাপতি পদত্যাগ করার অল্পদিন পরেই তিনি দলের মধ্যে চরমপন্থী ও প্রগতিশীল সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এরকম একটি ব্লক গঠন করার কাজ সুরু করেছিলেন। ১৯৩৯ সালের অনেক আগেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আন্তর্জাতিক যুদ্ধের সঙ্কট মুহূর্ত আসন্ন

এবং ভারতবর্ষের উচিত তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা। সাধারণভাবে তাঁর দেশবাসীর যথেষ্ট সমর্থন থাকলেও কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন না। ফরওয়ার্ড ব্লক গড়ে তোলায় তাঁর দুটি প্রত্যাশা ছিল। প্রথম, তিনি তাঁর নীতি ও লক্ষ্যের জন্য সাফল্যের সঙ্গে লড়তে পারবেন এবং আশা করবেন যে একদিন তাঁর মতের সমর্থনে কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেন। দ্বিতীয়, এমনকি যদি তাঁর প্রথম আশা পূর্ণ না হয় তাহলেও কোন বড় সঙ্কটের সময় তিনি নিজের মত অনুযায়ী এগিয়ে যেতে পারবেন। ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠন করে কংগ্রেসের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে—এই সমালোচনার উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন যে ভাসা ভাসা ঐক্য যা কার্যক্ষেত্রে আমাদের অচল করে এবং আসল ঐক্য যা আমাদের কর্মশক্তির স্ফূরণ ঘটায় এই দুয়ের পার্থক্য বুঝতে হবে। সুভাষচন্দ্র বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন যে জাতীয় কংগ্রেসে যদি একটি সংগ্রামশীল ব্লক গড়ে তোলার কাজে অবহেলা করা হয় বা স্থগিত রাখা হয়, তাহলে যখন অতর্কিতে কোন আন্তর্জাতিক সঙ্কট সত্যিই ভারতবর্ষের ওপর এসে পড়বে তখন আমরা দেখব যে আমরা প্রস্তুত নই। ফলে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ যে ভুল করেছিল, আবার সেই ভুলেরই পুনারাবৃত্তি হবে।

সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রচার অভিযান ১৯৩৯ সালের মে মাস থেকে পূর্ণোদ্যমে চলেছিল। সব কংগ্রেসীদের কংগ্রেস মন্ত্রিসভার এবং কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের নীতি ও কার্যধারা সমালোচনা করার বা প্রকাশ্যে আলোচনা করার গণতান্ত্রিক অধিকার দাবী করে সেই বছরই জুলাই মাসে ফরওয়ার্ড ব্লকের আহ্বানে সারা ভারতবর্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছিল। নতুন কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্র-প্রসাদ সুভাষচন্দ্রকে এধরণের বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র সভাপতির এই নির্দেশ অগণতান্ত্রিক মনে করেছিলেন এবং তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। ফলে তিন বছরের জন্য দলে নির্বাচিত কোন পদ নেওয়ার অধিকার থেকে

তাঁকে বঞ্চিত করে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রচার অভিযানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল প্রধানতঃ ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম এবং যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা। এটা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে এই অভিযানের গণ-আবেদন ছিল প্রচণ্ড—সুভাষ যখন সারা দেশে সফর করছিলেন তখন তাঁর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাতেই তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। কয়েকমাস পরে গান্ধীজী মন্তব্য করেছিলেন যে কংগ্রেস সভাপতির পদত্যাগ করার পর দেশে সুভাষচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা কমার চেয়ে বরং বেড়ে গিয়েছিল।

১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর মাদ্রাজের সমুদ্র উপকূলে একটি বিরাট জনসভায় সুভাষচন্দ্র যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, তাঁকে জানান হল যে ব্রিটেন এবং জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেছে। আর কথা না বাড়িয়ে সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন যে ভারতবর্ষের স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত এবং স্বাধীনতার জন্য এখনই তাকে আঘাত হানতে হবে।

ভারতবর্ষের নেতাদের বা জনগণের মত গ্রহণের কোন লোক দেখানো ভাণ পর্যন্ত না করে ইংরেজ বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ভারতবর্ষকে যুদ্ধে অংশীদার বলে ঘোষণা করলেন এবং আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য কঠোরতম ক্ষমতা হাতে নিয়ে অর্ডিনান্স জারী করলেন। মহাত্মা গান্ধী তারপরেই বড়লাটের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে স্বাধীনতার প্রশ্নে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই বিপদের সময় ভারতবর্ষের উচিত ইংরাজদের সঙ্গে সহযোগিতা করা। সুভাষচন্দ্র অবশ্য বলেছিলেন যে ১৯২৭ সাল থেকে বছরের পর বছর গৃহীত প্রস্তাবগুলিতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরিষ্কার নীতি হচ্ছে ইংরাজদের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের স্বার্থে ভারতবর্ষকে শোষণ করার বা যুদ্ধের বিরোধিতা করা। এইভাবে আমাদের ইতিহাসের এক চরম মুহূর্তে দুটি পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা আমাদের জাতীয় আন্দোলনের প্রধান ধারা থেকে উদ্ভূত হল।

২৪

১৯৩৯ সালের ২২শে জুন বোম্বাইয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। যেসব কংগ্রেসী চেয়েছিলেন যে ইংরাজদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম আবার তাড়াতাড়ি আরম্ভ করা হোক এবং যাঁরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতবর্ষের অংশ গ্রহণ করার বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁদের সকলের কাছ থেকে সুভাষচন্দ্র উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পেলেন। প্রাণবন্ত আশাবাদের পরিবেশে ফরওয়ার্ড ব্লকের যাত্রা সুরু হল। নিজেদের আলাদা আলাদা পরিচয় মুছে দিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে মিশে যাবার জন্য সুভাষচন্দ্র যে আবেদন করেছিলেন অন্য বামপন্থী দলগুলি তাতে সাড়া দেয়নি। এই পরিস্থিতিতে সুভাষচন্দ্রকে চেয়ারম্যান করে ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি, এম. এন. রায়ের র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি, ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কম্যুনিষ্টরা তখন এই নামে পরিচিত ছিলেন) প্রভৃতি বিভিন্ন দল নিয়ে একটি বাম-ঐক্য কমিটি গঠিত হল। স্থির হল যে বাম-ঐক্য কমিটি কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থী প্রাধান্যের বিকল্প হিসাবে ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসাবে কাজ করবে। কিন্তু এই প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। কিছু সময় অতিক্রান্ত হবার পর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে অমিল ও মতভেদের ফলে বাম-ঐক্য কমিটি কংগ্রেসের দক্ষিণ-গোষ্ঠীর এক দুর্বল বিকল্প হয়ে রইল। সুতরাং যুদ্ধবিরোধী অভিযান এবং তাড়াতাড়ি জাতীয় সংগ্রাম আবার সুরু করার প্রচারের দায়িত্ব বিশেষ করে সুভাষচন্দ্রের এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের ওপর পড়ল। ১৯৩৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর যুদ্ধের প্রশ্নে মনোভাব স্থির করার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসল। সুভাষচন্দ্রকে এই সভায় যোগদানের জন্য বিশেষ আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল। তিনি স্পষ্ট ভাষায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করে বললেন যে কংগ্রেসের কর্তব্য অবিলম্বে স্বাধীনতার সংগ্রাম সুরু করা এবং আরও বললেন যে যদি কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড

এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, ফরওয়ার্ড ব্লকই এ কাজ সুরু করবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি শেষপর্যন্ত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করল যার সারমর্ম হল কয়েকটি শর্তে ব্রিটেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহ-যোগিতার প্রস্তাব। এর উত্তরে একমাস পরে ইংরাজ বড়লাট ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে স্বায়ত্তশাসন দেবার একটা ইচ্ছা প্রকাশের বেশি আর কিছু দিলেন না—দশ বছর আগে লর্ড আরউইন প্রথম যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। অক্টোবর মাসের শেষে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলিকে পদত্যাগ করতে বলে এবং আইন অমান্যের প্রচ্ছন্ন ভীতি প্রদর্শন করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে বড়লাটকে উত্তর পাঠায়। সুভাষচন্দ্র আশা করেছিলেন যে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগের পর আইন অমান্য এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি বাতিল করা হবে। কিন্তু তিনি নিরাশ হলেন। তিনি তাই যুদ্ধে সহযোগিতার বিরুদ্ধে এবং অবিলম্বে স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামের পক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিরাট গণ-বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে অভিযান আরও জোরদার করলেন। ১৯৩৯-এর অক্টোবর মাসে নাগপুরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মেলন হল। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে ফরওয়ার্ড ব্লক এবং স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী পরিচালিত কিষাণ সভার উদ্যোগে বিহারের রামগড়ে নিখিল ভারত আপোষ-বিরোধী সম্মেলন নামে একটি বিরাট সর্বভারতীয় সমাবেশ হল। ঐ একই স্থানে একই সময়ে কংগ্রেসের যে বার্ষিক অধিবেশন হয়েছিল, এটি আকারে তার চেয়েও বড় হয়েছিল। এই সম্মেলনে অভিভাষণ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন 'আমরা যে সঙ্কটের মধ্যে পড়েছি ভারতীয় ইতিহাসে তা বিরল হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে তা নতুন কিছু নয়···ভারতবর্ষে আমরা এখন একটি যুগের শেষ প্রহর প্রত্যক্ষ করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা নতুন এক যুগের ঊষাকে স্বাগত জানাচ্ছি। সাম্রাজ্যবাদের যুগ শেষ হয়ে আসছে, আর স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের যুগ আমাদের সামনে দেখা দিচ্ছে···এই ধরণের সঙ্কট একটি জাতির নেতৃত্বের কঠিনতম

পরীক্ষা···বর্তমান সঙ্কট আমাদের জাতীয় নেতৃত্বকে সেই পরীক্ষার মুখোমুখি এনে ফেলেছে, কিন্তু দুভার্গ্যক্রমে আমাদের নেতৃত্ব ব্যর্থ ···বর্তমান সঙ্কটের সবচেয়ে বেদনাদায়ক ব্যাপার হল যাদের এতদিন বামপন্থী বলে গণ্য করা হত, তাদের মধ্যে অনৈক্য। অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে বামপন্থীবাদের অগ্নি পরীক্ষার সময় বলে বিবেচিত হবে। বর্তমান যুগ হল আমাদের আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পর্যায়। এই যুগে আমাদের প্রধান কাজ হল সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করা এবং ভারতের জনগণের জন্য জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করা। স্বাধীনতা এলে জাতীয় পুনর্গঠনের যুগ সুরু হবে এবং সেটি হবে আমাদের আন্দোলনের সমাজবাদের যুগ।'

১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে সুভাষচন্দ্র একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা (ফরওয়ার্ড ব্লক) প্রকাশ সুরু করলেন। তিনিই তার সম্পাদক হলেন। এই পত্রিকায় তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধারাবাহিকভাবে স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় লিখতেন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা পাঠকদের সামনে তুলে ধরার জন্য শাস্ত্রসিদ্ধ যুক্তিপূর্ণ আক্রমণ, সরস জবাব, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ দিয়ে তিনি তাঁর সম্পাদকীয় দক্ষতার সদ্ব্যবহার করতেন। তাঁর সফরের অভিজ্ঞতার কথা এবং সংগ্রাম ও স্বার্থত্যাগের জন্য তাঁর আহ্বানে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তিনি যে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পেতেন তাও তিনি পত্রিকায় বর্ণনা করতেন। তিনি এই বলে গণ-পরিষদের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন যে কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পরই অস্থায়ী জাতীয় সরকারের উদ্যোগে সত্যিকার গণ-পরিষদ গঠিত হতে পারে।

আপোষ-বিরোধী সম্মেলনের অল্পদিনের মধ্যেই ইংরাজ সরকার সারা দেশে ফরওয়ার্ড ব্লকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং ব্যাপক ধরপাকড় করল। ইংরাজদের আক্রমণ এবং কংগ্রেস দক্ষিণপন্থীদের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে সুভাষচন্দ্র ৯৪০ সালের জুন মাসে নাগপুরে ফরওয়ার্ড ব্লকের দ্বিতীয় সম্মেলনের আয়োজন করলেন। নাগপুরে সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লককে এবং জনগণকে একটি নতুন স্লোগান

দিলেন—"ভারতের জনগণের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা চাই।" সেই সময় ইয়োরোপীয় যুদ্ধ সবচেয়ে সঙ্কটের পর্যায়ে পৌঁছেছে। হিটলার প্রায় সমগ্র পশ্চিম ইয়োরোপ দখল করেছে এবং ইটালী যুদ্ধে যোগদান করেছে। নাগপুর থেকে ফেরবার পথে সুভাষ সেবাগ্রামে গিয়ে মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করেন। এটাই ছিল তাঁদের মধ্যে শেষ দেখা। সেই অতি উপযুক্ত সময়ে জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য তিনি গান্ধীজিকে আবার আবেদন জানিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একমত হননি। তিনি বলেছিলেন যে তিনি (সুভাষ) তাঁর বিবেক ও বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন। গান্ধীজী শেষে বলেছিলেন যে সুভাষ যে পথের কথা বলেন সেই পথে যদি তিনি স্বাধীনতা অর্জনে সাফল্যলাভ করেন, তাহলে মহাত্মা গান্ধীই তাঁকে সর্বপ্রথম অভিনন্দন জানাবেন।

১৯৩৭ সালে সুভাষচন্দ্রের মুক্তিলাভের পরেই বাঙ্গলার কংগ্রেস-সেবীরা ঘোষণা করলেন যে কলিকাতায় একটি কংগ্রেস ভবন নির্মাণের জন্য 'সুভাষ কংগ্রেস ফাণ্ডে' অর্থ সংগ্রহ করে সুভাষচন্দ্রকে উপহার দেওয়া হবে। কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরুও ঐ তহবিলে দানের জন্য বাঙ্গলার জনগণের কাছে আবেদন করলেন। এক বছর পরে কলিকাতা কর্পোরেশন সুভাষচন্দ্রকে এক খণ্ড জমি দিলেন। সুভাষচন্দ্র তখন বাড়ীর প্ল্যান তৈরী করার কাজে হাত দিলেন—বাড়ীটি যে কেবল কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয়ই হবে তাই নয়, জাতি গঠনের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের এক বিরাট কেন্দ্রও হবে। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পরিকল্পনাটি পাঠালেন এবং প্রস্তাবিত ভবনটির একটি নামকরণের জন্য অনুরোধও জানালেন। রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবে সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা সমর্থন করলেন এবং ভবনটির নাম দিলেন—'মহাজাতি সদন'। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতন থেকে কলিকাতায় এলেন এবং ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে একটি মর্মস্পর্শী অনুষ্ঠানে মহাজাতি সদনের ভিত্তি স্থাপন করলেন। রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র দু'জনেই ঐ অনুষ্ঠানে

তাঁদের ভাষণে জোর দিয়ে বলেছিলেন যে এই সদনটি হবে সেই কল্যাণধর্মী কর্মযজ্ঞের জীবন্ত কেন্দ্র যা ব্যক্তির ও জাতির মুক্তির পথ সুগম করবে এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের মানবসম্পদের এবং ভারতীয় মহাজাতির সার্বিক উন্নয়ন ঘটাবে। ১৯৩৮ সালে এবং বিশেষ করে ১৯৩৯ সালের গোড়া থেকে যখন কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের তিক্ত মতবিরোধ চলছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত-ভাবে এবং আদর্শগতভাবে সুভাষের খুব কাছের মানুষ ছিলেন। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি শান্তিনিকেতনে সুভাষচন্দ্রকে একটি সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন। যদিও তখন প্রচণ্ড রাজনৈতিক মতবিরোধ খোলাখুলিভাবেই চলছিল, রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় সুভাষচন্দ্রকে একটি জনসম্বর্ধনা দিয়ে তাঁর নিজের মত দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন। দেশনায়ক নামে তিনি সুভাষচন্দ্রকে উদ্দেশ করে একটি ভাষণ লিখেছিলেন। অনেকেরই বিশ্বাস যে যাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতীর ওপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া না হয় সেজন্য সুভাষচন্দ্র নিজেই রবীন্দ্রনাথকে এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরে ঐ ভাষণটি প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তাতে অন্য বিষয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছিলেন—"সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো-আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি...আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্য দিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে অভিভূত করেনি। তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর

বিস্তৃত ক্ষেত্রে।...যাঁরা দেশের যথার্থ স্বাভাবিক প্রতিনিধি তাঁরা কখনোই একলা নন।...তাঁরা বর্তমানের গিরিচূড়ায় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের প্রথম সূর্যোদয়ের অরুণাভাসকে প্রথম প্রগতির অর্থ দান করেন। সেই কথা মনে রেখে আমি আজ তোমাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি। সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করি তোমার পার্শ্বে সমস্ত দেশকে। ...বহুকাল পূর্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙ্গালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশে বাণীদূত পাঠিয়েছিলুম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি। দেহে মনে তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব—আমার সে সময় আজ গেছে, শক্তি অবসন্ন।...তারপরে আশীর্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে যে দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।"

## ২৫

তিরিশ শতকের গোড়া থেকেই সুভাষচন্দ্র বলে আসছিলেন যে ভারতবর্ষে ইংরাজ সরকার এবং তার প্রতিপক্ষ ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের পারস্পরিক অবস্থা হল নিরস্ত্র কিন্তু বিদ্রোহী জনতা দ্বারা একটি সশস্ত্র দুর্গ অবরোধ করে রাখার মত। তাঁর মতে দু'টির যে কোন একটি উপায়ে ভারতের জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেন : প্রথম, শত্রু-অধিকৃত দুর্গের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অবরোধ এবং বয়কট, অর্থাৎ ব্যাপকতম গণ আইন অমান্য এবং অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা এবং দ্বিতীয়, সশস্ত্র আক্রমণ করে দুর্গ দখল করা। ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তখন জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতবর্ষের পরিস্থিতি তাঁর কাছে এইরকম মনে হয়েছিল : কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা এবং মহাত্মা গান্ধী গণসংগ্রাম ও ইংরাজদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের ছিলেন সম্পূর্ণ বিরোধী ; অন্যদিকে দেশের বামপন্থী

শক্তিগুলিকে একত্রিত ও সংহত করতে তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি দেখলেন যে এত দল এবং গোষ্ঠী রয়েছে যারা পুঁথিগতভাবে বামপন্থা স্বীকার করে, কিন্তু তারা ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ও অক্লান্ত আপোষবিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে প্রস্তুত নয়। আরও তিনি গভীর দুঃখের সঙ্গে দেখলেন যে ইংরাজ সরকার যখন ঐ পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে, মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার মত সাম্প্রদায়িক দলগুলি স্বাধীনতার জাতীয় প্রশ্ন এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা ভুলে সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবীগুলি তুলছে। সেই সময়কার সার্বিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্র তাই বাইরে থেকে সশস্ত্র আঘাত হানার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে বিদেশে যাবার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। এই সশস্ত্র আক্রমণের উদ্দেশ্য হবে ভারতবর্ষে ইংরেজ শক্তির শেষ আশ্রয়—ব্রিটিশ রাজের বেতনভুক ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মির আনুগত্য নষ্ট করে দেওয়া।

১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে সুভাষচন্দ্র চীনে যাবেন ভেবে ইংরাজ কর্তৃপক্ষের কাছে পাশপোর্ট চেয়েছিলেন, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। চুংকিং-য়ের তৎকালীন সরকারও ইঙ্গ-চীন চুক্তির বাধ্যবাধকতা থাকার দরুণ চাননি যে তিনি চীনে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী হন। ১৯৪০ সালের গোড়ার দিকে গোপনে দেশত্যাগ করে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ইয়োরোপের দিকে যাবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। ইতিমধ্যে ১৯৪০-এর এপ্রিল মাসে ফরওয়ার্ড ব্লক যে আইন অমান্য অভিযান সুরু করে তা বেশ গতি অর্জন করছিল। বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লার ওপর কলঙ্কস্বরূপ কলিকাতায় যে হলওয়েল মনুমেণ্ট ছিল সেটির অপসারণের জন্য সুভাষচন্দ্র নিজে একটি আন্দোলন সুরু করেছিলেন। তাঁর ডাকে হিন্দু ও মুসলমান যুবকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে সাড়া দিয়েছিল। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে যেদিন হলওয়েল মনুমেণ্টে সত্যাগ্রহের জন্য একদল স্বেচ্ছাসেবককে সুভাষচন্দ্রের নিজের

নেতৃত্ব দেবার কথা, সেদিন ভারতরক্ষা আইনে তাঁকে গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সী জেলে পাঠান হল। রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে দুটি মামলাও সুরু করা হল। জেলে থাকাকালীন তিনি পূর্ব বাঙ্গলার ঢাকা কেন্দ্র থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন্দ্রীয় বিধান সভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কলিকাতার প্রেসিডেন্সী জেলেই সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাবে; কিন্তু ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীরা বিনা সংগ্রামে ভারতের জনগণকে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে কেবল যদি সে যুদ্ধের সঙ্কটের মধ্যে সক্রিয়ভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। তিনি অনুভব করেছিলেন যে ইতিহাস যখন বিশ্বের মঞ্চে তৈরী হচ্ছে, তখন কারাগারে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল হবে। তিনি দেখলেন যে আইনসঙ্গতভাবে তাঁর মুক্ত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই তিনি এই কথা বলে সরকারকে একটি চরমপত্র পাঠালেন যে যখন তাঁকে আটক রাখার কোন নৈতিক বা আইনগত যুক্তি নেই, তখন তিনি আমৃত্যু অনশন সুরু করবেন, যদি না তাঁকে অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি সরকারের কাছে কয়েকটি ঐতিহাসিক চিঠি লিখেছিলেন, যার মধ্যে একটিকে তিনি তাঁর শেষ রাজনৈতিক দলিল বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তার মধ্যে তিনি লিখেছিলেন—

"কোন তাৎক্ষণিক, নির্দিষ্ট লাভ না হলেও কোন নির্যাতন ভোগ, কোন স্বার্থত্যাগ কখনও ব্যর্থ হয় না…

এই মর জগতে সবই নশ্বর এবং বিনষ্ট হয়, কিন্তু আদর্শ ভাবধারা ও স্বপ্ন অবিনশ্বর। এক ব্যক্তি কোন এক মতাদর্শের জন্য মৃত্যুবরণ করতে পারে, কিন্তু সেই ভাবধারা তার মৃত্যুর পরে সহস্র জীবনে মূর্ত হয়ে ওঠে।

কেউ কোন জাতির জন্য জীবন ধারণ করেছিলেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন এই অনুভূতির চেয়ে কোন ব্যক্তির কাছে আর বড় সান্ত্বনা

কি হতে পারে ?…

নীতির বেদীতে শান্তিপূর্ণ আত্মাহুতির চেয়ে আর উন্নততর জীবন আর কি হতে পারে ?”

১৯৪০ সালে নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কালীপূজার দিন সুভাষচন্দ্র তাঁর অনশন সুরু করেছিলেন। প্রথম দিকে সরকার খুব কড়া মনোভাব নিয়েছিলেন এবং তাঁর চরমপত্রের উত্তর দেবারও দরকার মনে করেনি। দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার বাঙ্গলা সরকারকে খুব দৃঢ়ভাবে বলে দিয়েছিল যে যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন সুভাষচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করে রাখতে হবে। বাঙ্গলা সরকার তাই তাঁর মেজদাদা শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিল সুভাষচন্দ্রকে জানাতে যে সরকারের মনোভাব অত্যন্ত প্রতিকূল, সুতরাং তাঁর অনশন সুরু করা উচিত হবে না। যাই হোক প্রায় এক সপ্তাহ অনশন চলার পর বাঙ্গলা সরকার হঠাৎ ভয় পেয়ে গিয়েছিল যদি তাদের বন্দী জেলেই মারা যায়। উচ্চপদস্থ অফিসারদের একটি গোপন মিটিং-য়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হোক, কিন্তু পরিকল্পনা ছিল যে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হলেই আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। বাঙ্গলা সরকারের এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। বাঙ্গলা সরকার কেন্দ্রকে আশ্বাস দেয় যে তাঁরা সুভাষের সঙ্গে 'ইঁদুর ও বেড়াল' এর খেলা খেলছেন এবং চিন্তার কোন কারণ নেই।

মুক্তিলাভের পরই সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষ থেকে তাঁর নিষ্ক্রমণের পরিকল্পনা সুরু করে দিলেন। এই অবসরে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর শেষ পত্রালাপ করেছিলেন। চিঠিপত্রে সুভাষচন্দ্র শেষবারের মত গান্ধীজীর কাছে স্বাধীনতার জন্য যে কোন আন্দোলন তিনি করবেন, এমনকি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ হলেও, তাঁর নিঃশর্ত সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের প্রতি আনুগত্যের অপরাধে বিভিন্ন ব্যক্তি ও কমিটির প্রতি যথেচ্ছ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বাঙ্গলা কংগ্রেসে ভাঙ্গন ধরেছিল, সেখানে ঐক্য

পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যও তিনি গান্ধীজীর কাছে অনুরোধ করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী উত্তরে বলেছিলেন যে তাঁদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে; যতক্ষণ পর্যন্ত একে অন্যের মতে না আসছে ততক্ষণ তাদের আলাদা পথেই চলা উচিত।

মুক্তির পরে কলিকাতার বাড়ী থেকে এবং শেষে ভারতবর্ষ থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উপজাতি অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে নিষ্ক্রমণের বাস্তব পরিকল্পনা করার জন্য সুভাষচন্দ্র দু'জনকে তাঁর কাছে ডেকে ছিলেন। প্রথম শরৎচন্দ্রের পুত্র—তাঁর ভাইপো শিশির, আর দ্বিতীয় জন হলেন অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও পেশোয়ারের ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা মিঞা আকবর শাহ। ভাইপোকে হাতের কাছেই পাওয়া গেল; সুভাষচন্দ্র ঐ যুবককে তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে টানলেন। একেবারে গোপনে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার উপায়গুলি সম্বন্ধে তিনি শিশিরের সঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে সুরু করলেন। শিশিরের কাজ হবে একদিন রাত্রে গাড়ী চালিয়ে তাঁকে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে একটি রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছে দেওয়া, যেখান থেকে তিনি পেশোয়ার যাবার ট্রেন ধরতে পারবেন। কাকা ও ভাইপো খুঁটিনাটি সবকিছু বিচার করে কয়েকটি বিকল্প পরিকল্পনা আলোচনা করে শেষপর্যন্ত একটি অব্যর্থ প্ল্যান চূড়ান্ত করলেন। শিশিরকে বলা হল যে আর একজন তাঁর এই গোপন যাত্রার কথা জানবে, সে হল তাঁর তরুণী ভাইঝি ইলা। বাড়ীতে একটি সাজানো গল্প বলা হবে যে সুভাষচন্দ্র কয়েকদিনের জন্য নির্জনে ধর্মীয় অনুশীলন বা ব্রত করছেন। ইতিমধ্যে টেলিগ্রাম বার্তা পেয়ে পেশোয়ার থেকে মিঞা আকবর শাহ এসে পৌঁছলেন। শিশিরকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল এবং সুভাষচন্দ্রের কথামত তাঁরা দুজনে তাঁর ছদ্মবেশের কয়েকটি জিনিষপত্র কেনাকাটা করলেন। স্থির হয়েছিল যে মহম্মদ জিয়াউদ্দিন এই নাম নিয়ে এক ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ভ্রাম্যমান ইন্‌স্পেক্টর সেজে সুভাষচন্দ্র উত্তরপ্রদেশের মুসলমানের ছদ্মবেশে যাবেন। আফগানিস্থানের ভেতর দিয়ে সুভাষচন্দ্রের উপজাতি অঞ্চল পার হওয়ার সব

ব্যবস্থা করার ভার থাকবে মিঞা আকবর শাহর ওপর। ডিসেম্বর মাসের বেশির ভাগটাই শরৎচন্দ্র কলিকাতার বাইরে ছিলেন; জানুয়ারী মাসের গোড়াতেই তিনি ফিরে এলে দুই ভাই অতি গোপন আলোচনায় বসলেন। শরৎচন্দ্র গোটা পরিকল্পনার কিছু অদল-বদল করে তাতে চূড়ান্ত রূপ দিলেন। সুভাষচন্দ্র এবং মিঞা আকবর শাহর মধ্যে যাত্রার দিন ঠিক করা ছিল, কিন্তু সেটা গোপন রাখা হল।

২৬

১৯৪১ সালের ১৬ই জানুয়ারী, তাঁর যাত্রার নির্দিষ্ট দিনের দিন দুই আগে সুভাষচন্দ্র তাঁর পরিবারের সকলকে জানিয়ে দিলেন যে তিনি কয়েকদিনের জন্য নির্জনে থাকবেন। তিনি কারুর সঙ্গে দেখা করবেন না, কথাও বলবেন না, এমনকি টেলিফোনেও নয়। তাঁর ঘরটিকে পর্দা দিয়ে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হল। ব্যবস্থা হল যে ঠাকুর পর্দার নীচে দিয়ে খাবার দিয়ে দেবে, আর পরদিন এঁটো বাসনপত্র নিয়ে নেবে। সেই ঐতিহাসিক রাত্রে তিনি মা এবং পরিবারের অন্যান্যদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে রাত্রের আহার সারলেন। পরিবারের অধিকাংশ লোকজন যে যার ঘরে চলে যাওয়ার পর সুভাষচন্দ্র গৃহত্যাগের শেষ প্রস্তুতি নিলেন। ঠিক হয়েছিল যে ঐ বাড়ীতে থাকে এমন আরও দু'জন ভাইপো নির্জনবাসের লোক-ভোলানো গল্পটি চালু রাখায় ইলাকে সাহায্য করবে। রাত্রি ৯টা নাগাদ শিশির এসে পৌঁছলেন। তিনি তাঁর মজবুত জার্মান গাড়ী—'ওয়াণ্ডারার'-এ সুভাষের সঙ্গে যাবার বাক্সগুলি নিয়ে এলেন—বেশ বড় করে সেগুলির ওপর লেখা M. Z.। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হল, কারণ পরিবারের দু'একজন ব্যাপারটা কি হচ্ছে এবিষয়ে কিছুটা সন্দিহান হয়ে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছিলেন। ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারী রাত্রি প্রায় ১-৩০টায় পথ নিরাপদ মনে হল, শিশির গাড়ী চালিয়ে সুভাষকে নিয়ে গৃহত্যাগ করলেন। সুভাষচন্দ্রের পরনে ছিল ঘন খয়েরী রংয়ের

শেরোয়ানী, ঢিলে পাজামা, ফিতা-লাগান মজবুত ইয়োরোপীয় জুতা এবং একটি কালো আস্ত্রাখান ধরণের ফারের টুপি।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে শিশির ইচ্ছে করেই দক্ষিণ দিকে গেলেন, পাছে সাদা-পোশাকের যে-সব পুলিশ সুভাষের ওপর নজর রাখত, তারা যদি গাড়ীটির গতিবিধি লক্ষ্য করে। যদিও সরকার তাঁকে নিঃশর্তভাবে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল, তবুও দিন রাত তাঁর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হত। এখন জানা গেছে যে পুলিশ বিভাগ এমন কি বাড়ীর ভেতরেও কিছু লোক রেখেছিল, তাদের পরিচিতি অবশ্য এখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র এর আগেই তাঁর এক অতি বিশ্বস্ত লোক মারফৎ গোয়েন্দা দফতর থেকে তাঁর নিজের সম্বন্ধে গোপন তথ্য ও দলিলগুচ্ছ আনিয়েছিলেন, একরাত্রের মধ্যেই পড়ে ফেলে পরের দিনই আবার সেগুলি যথাস্থানে ফেরত দিয়েছিলেন। এইভাবে গোয়েন্দা বিভাগ তাঁর সম্বন্ধে কি জানে এবং কোন সূত্র থেকে তা তিনি জানতেন।

উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে দুই পথিকের সারা-রাত চলল এক রোমাঞ্চকর যাত্রা। ভোরবেলা তাঁরা আসানসোল পৌঁছে গাড়ীতে আবার তেল ভরে নিলেন। ১৯৪১-এর ১৭ই জানুয়ারী সকাল ৯টায় তাঁরা ধানবাদের কয়েক মাইল দূরে বারারি নামে একটি নির্জন জায়গায় গিয়ে পৌঁছলেন। শরৎচন্দ্রের বড় ছেলে অশোক সপরিবারে বারারিতে বাস করতেন। অশোকের বাংলোর প্রায় আধ মাইল দূরে শিশির কাকাকে নামিয়ে দিলেন এবং গাড়ী চালিয়ে খুবই স্বাভাবিকভাবে একাই বাংলোয় প্রবেশ করলেন। তিনি ছদ্মবেশে কাকার আসন্ন আবির্ভাবের বিষয় তাঁর দাদাকে আগাম জানিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে সুভাষচন্দ্র হেঁটে এসে পৌঁছলেন এবং নিজেকে একজন ইন্সিওরেন্স এজেন্ট, কাজে এসেছেন—এই বলে পরিচয় দিলেন। অশোকের বাড়ীর পরিচারকদের সামনে এবং তাদের শুনিয়ে একটি সাজানো নাটক অভিনীত হল। সব কথাবার্তাই ইংরাজীতে হচ্ছিল। এমন কি অশোক শিশিরকে আনুষ্ঠানিকভাবে

আগন্তুকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আপাত আগন্তুকের অনুরোধে তাঁকে ঐ দিনটির জন্য অতিথির ঘরে থাকতে দেওয়া হল। পরিকল্পনা মাফিক সন্ধ্যায় লোক দেখিয়ে সকলকে বিদায় জানিয়ে সুভাষ পায়ে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে শিশির এবং সস্ত্রীক অশোক শিশিরের গাড়ীতে বেরিয়ে পড়লেন এবং পথের ধার থেকে সুভাষচন্দ্রকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে গোমোর পথ ধরলেন। মধ্যরাত্রেরও বেশ পরে দিল্লী-কালকা মেল গোমোয় এসে পৌঁছলো। সুভাষচন্দ্র নিজে তাঁর টিকিট কিনলেন, একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠলেন এবং আবার যাত্রা সুরু করলেন।

ব্যবস্থা হয়েছিল যে সুভাষ দিল্লী থেকে ফ্রন্টিয়ার মেল ধরে ১৯৪১-এর ১৯শে জানুয়ারী পেশোয়ার পৌঁছবেন। আকবর শাহ যখন ষ্টেশন গেট দিয়ে যাত্রীদের বেরিয়ে আসা লক্ষ্য করছিলেন, তিনি একজন সম্ভ্রান্ত-দর্শন মুসলমান ভদ্রলোককে দেখতে পেলেন এবং চিনতে পারলেন। তিনি তাঁকে চুপি চুপি একটি টাঙ্গায় উঠতে বললেন। টাঙ্গাওয়ালাকে বলে দিলেন তাঁকে ডিন্‌স্ হোটেলে নিয়ে যেতে, আর তিনি আর একটি টাঙ্গায় তাঁকে অনুসরণ করলেন। পথে যেতে যেতে মত বদলে তাঁকে তাজমহল হোটেলে নিয়ে যাওয়া হল। পেশোয়ার সহরের মধ্যে দিয়ে আকবর্ শাহ যখন ফিরছিলেন, তখন একজন পুরানো বিশ্বস্ত বন্ধু আবাদ খানের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তিনি বিশ্বাস করে সব কথা তাঁকে বললেন। আগে থেকেই আবাদ খানের এরকম গোপন পরিভ্রমণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর পরামর্শে সেই রাত্রেই সুভাষচন্দ্রকে হোটেল থেকে আবাদ খানের বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হল; সেখানে তিনি ছ'দিন ছিলেন। আকবর শাহ স্থির করেছিলেন যে মহম্মদ শাহ এবং ভগত রাম তলওয়ার—এই দুই যুবকের মধ্যে একজন উপজাতি অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে কাবুল যাত্রায় সুভাষচন্দ্রের রক্ষীরূপে তাঁর সঙ্গে যাবে। তাঁদের জানান হল। শেষ পর্যন্ত স্থির হল যে ভগত রামকেই সেই দায়িত্ব দেওয়া হবে।

পেশোয়ারে সুভাষচন্দ্রের ছদ্মবেশে রূপান্তর ঘটল। এখন থেকে

তাঁকে একজন পাঠান্ হতে হবে। আবাদ খানের বাড়ীতে তাঁকে পাঠান্দের সামাজিক রীতি নীতি শিখিয়ে দেওয়া হল যাতে তাঁর সামাজিক ও জনসাধারণের সঙ্গে আচার ব্যবহার সঠিক হয়। তিনি তাঁর আগের পোষাক ত্যাগ করলেন এবং তাঁকে পাগড়ী সমেত পুরো পাঠান্ পোষাক দেওয়া হল। ইন্সিওরেন্স এজেন্ট এখন হলেন ভগত রামের কালা ও বোবা বড় ভাই, যাঁকে চিকিৎসার জন্য এখন একটি পবিত্রস্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং তারপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে কাবুলে।

আবাদ খানের ব্যবস্থা করে দেওয়া একটি গাড়ীতে ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী সকালে ভগত রাম, মহম্মদ শাহ এবং একজন পথপ্রদর্শক সঙ্গে নিয়ে সুভাষচন্দ্র আফ্রিদি উপজাতি অঞ্চলে যাবার জন্য রওনা হলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী সেই দিনই তাঁর পরিবারের লোকেরা কলিকাতা থেকে তাঁর অন্তর্ধানের কথা ঘোষণা করলেন।

তিন পথিক উপজাতি অঞ্চলের আসল সীমানার মাত্র এক ফারলং দূর থেকে তাঁদের দীর্ঘ পথযাত্রা সুরু করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের আফগানিস্থান যাবার জন্য যে পথ বাছা হয়েছিল, তা ছিল সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সবচেয়ে দুর্গম এবং এই পথ সাধারণতঃ যাত্রীরা এমন কি অতীতের বিপ্লবীরাও ব্যবহার করেন নি। আংশিক তুষারাবৃত খাড়া পাহাড়ে তাঁদের উঠতে হয়েছিল। পরের দু'রাত্রি তাঁরা পথের ধারে ছোট ছোট গ্রামে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। ২৮শে জানুয়ারী মধ্যরাত্রির বেশ পরে তাঁরা আফগান ভূখণ্ডের প্রথম গ্রামটিতে পৌঁছলেন। সুভাষচন্দ্র যাতে ক্লান্ত হয়ে না পড়েন এজন্য যাত্রার শেষের দিকে তাঁকে একটি ঘোড়া দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বরফে পিচ্ছিল একটি ঢালু জায়গায় নামবার সময় ঘোড়ার পা হড়কে যাওয়ায় তিনি পড়ে গিয়েছিলেন। হেঁটে এবং ঘোড়ার পিঠে চড়ে অনেক গ্রামগঞ্জ অতিক্রম করে দু'দিন পরে তাঁরা পেশোয়ার-কাবুল রাজপথে গারডি নামে একটি গ্রামে পৌঁছলেন। আফগান ভূখণ্ডে পৌঁছবার পর আবাদ খানের পথ-প্রদর্শক ফিরে গেল। সুভাষচন্দ্র এবং ভগত রাম রাজপথ দিয়ে

এগোচ্ছিলেন এমন সময় একটি চায়ের পেটি ভর্তি ট্রাক এসে গেল, সেই ট্রাকে সওয়ার হয়ে ২৮শে জানুয়ারী রাত্রি ১০ টায় তাঁরা জালালাবাদ পৌঁছলেন। লোক দেখানো চালচলন বজায় রাখার জন্য জালালাবাদের কাছে তাঁরা আড্ডা সরিফ ধর্মস্থানে গেলেন। সেখানে তাঁরা হাজি মহম্মদ আমিন নামে এক রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগও করলেন।

৩০শে জানুয়ারী তাঁরা একটি টাঙ্গায় কাবুল যাত্রা করলেন। পথে টাঙ্গা ছেড়ে দিয়ে একটি ট্রাকে চড়ে পরদিন সকালে বুদখাক্ চেক পোষ্টে পৌঁছলেন। সেখান থেকে আবার একটি টাঙ্গায় করে তাঁরা ৩১শে জানুয়ারী সকাল ১১ টায় কাবুল পৌঁছলেন।

কাবুলে তাঁরা দু'জনেই পুরোপুরি নবাগত। তাঁরা একটি সরাই খুঁজছিলেন ; লাহোরি গেট-এর কাছে একটির সন্ধান পাওয়া গেল। জায়গাটি মানুষের বসবাসের অযোগ্য ; কিন্তু কোন বিকল্প ছিল না। খাবার মধ্যে তাঁরা মিষ্টি চায়ে ডুবিয়ে রুটি খেতেন।

সুভাষচন্দ্র ইংরাজ পুলিশের প্রত্যক্ষ কবল থেকে মুক্তি পেলেও শীঘ্রই তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর পরীক্ষা শেষ হয়নি, সবে সুরু হয়েছে। পরের পঁয়তাল্লিশ দিন অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে এবং সবসময় আফগান পুলিশ বা ব্রিটিশ এজেন্টের নজরে পড়ে যাবার আশঙ্কায় সুভাষচন্দ্রকে চরম কষ্টের মধ্যে কাটাতে হয়েছিল। তাঁর এবং তাঁর গন্তব্যস্থল ইয়োরোপের মাঝখানে ছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন। পাঞ্জাবের কিরত কিষাণ-পার্টির কোন কোন সদস্য ইতিমধ্যেই মস্কোতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁদের মাধ্যমে তিনি সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করার জন্য আগেই সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তিনি দেখলেন যে কোন ব্যবস্থাই হয় নি। সত্যিই যে কি ঘটল তা আজও জানা যায়নি। সুতরাং অবস্থা এই দাঁড়াল যে যাতে ধরা না পড়ে যান, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাবুল ত্যাগ করার একটি উপায় বার করতে সুভাষচন্দ্রকে আবার নতুন করে কাজ সুরু করতে হল।

কাবুলে লাহোরি গেটের সরাইয়ে সুভাষচন্দ্র কালা ও বোবা সেজেই চালাচ্ছিলেন। কিন্তু একজন সন্দিহান আফগান পুলিশ প্রায়ই সেখানে আসা-যাওয়া করতে লাগল। তার মুখ বন্ধ করার জন্য সুভাষচন্দ্র তাঁর সোনার হাত-ঘড়িটি পর্যন্ত তাকে দিয়েছিলেন, কিন্তু সে বার বারই ফিরে আসতে লাগল এবং তাঁদের দু'জনকে কোতোয়ালীতে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। ইতিমধ্যে সোভিয়েট মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টায় ভগত রাম কোন সাড়া পেলেন না। ৬ই ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্র নিজেই জার্মান দূতাবাসে একরকম জোর করেই অনধিকার প্রবেশ করলেন এবং জার্মান মন্ত্রী পিলগারের সঙ্গে দেখা করলেন। ব্যক্তিগতভাবে পিলগার বন্ধুভাবাপন্ন হলেও নিজে কিছু করতে পারলেন না এবং বার্লিন থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাওয়ার জন্য তিনি সময় চাইলেন। কাবুলে সিমেন্স কোম্পানীর এক প্রতিনিধি সুভাষচন্দ্র এবং জার্মান দূতাবাসের মধ্যে মধ্যস্থের কাজ করবেন বলে ঠিক হল।

সুভাষচন্দ্র এবং ভগত রাম দু'জনেই বুঝলেন যে সরাইয়ে বেশীদিন থাকা অত্যন্ত ঝুঁকির কাজ হয়ে যাচ্ছে। ভগত রাম তাই তাঁর পেশোয়ারের পুরানো পরিচিত উত্তমচাঁদ মালহোত্রাকে খুঁজে বার করলেন। তিনি কাবুলে ব্যবসা করতেন। ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সুভাষচন্দ্র উত্তমচাঁদের বাড়ীতে উঠে গেলেন এবং তাঁর বাড়ীর একটি ঘরে নিজেকে আবদ্ধ রাখলেন। এখানে তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ এবং স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ আশ্রয় পেলেন। তবু তিনি অনির্দিষ্টকাল কাবুলে বসে থাকায় বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। মরিয়া হয়ে তিনি ঠিক করলেন যে আফগান-রুশ সীমান্তে বসবাসকারী পেশোয়ারের এক পলাতক আসামীর সাহায্যে নিজেই সোভিয়েট ইউনিয়নে চলে যাবার চেষ্টা করবেন। তিনি যখন এই চিন্তা করছিলেন, সেই সময় ২৩শে

ফেব্রুয়ারী তাঁর কাছে সিমেন্স অফিস থেকে একটি বার্তা পৌঁছল যাতে তাঁকে আরও ব্যবস্থাদি করার জন্য ইটালীয় মন্ত্রী আলবের্তো কোয়ারোনির সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হল। কোয়ারোনির সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতকার সারারাত্রি ধরে চলেছিল। তাঁর ভবিষ্যৎ সংগ্রামের ধারা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের নিজের মনে ধারণা ছিল সুস্পষ্ট। ইয়োরোপে স্বাধীন ভারত সরকার গঠন এবং জার্মানী ও ইটালীতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে মুক্তি ফৌজ গড়ে তোলার বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনার কথা তিনি কোয়ারোনিকে জানালেন। কোয়ারোনি রোমে একটি অনুকূল রিপোর্ট পাঠালেন। ব্যবস্থা হল যে শ্রীমতী কোয়ারোনি খবরাখবর আদানপ্রদানের জন্য মাঝে মাঝে উত্তমচাঁদের দোকানে আসবেন। জার্মান ও ইটালীয় সরকার সুভাষচন্দ্রের ইয়োরোপ যাত্রার প্রশ্নটি এবং রাশিয়ার মধ্যে দিয়ে সুভাষচন্দ্রের যাওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে মস্কোয় সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে আলোচনা করল। মস্কোতে যখন গোপন কথাবার্তা চলছিল তখন সুভাষচন্দ্র আফগানিস্থানে এবং উপজাতীয় অঞ্চলে ভবিষ্যতে কাজকর্মের জন্য নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলি পাকা করে তাঁর সময়ের সদ্ব্যবহার করলেন। সোভিয়েটের দিক থেকে স্পষ্ট উত্তর পেতে প্রায় চার সপ্তাহ সময় লেগে গেল। তিন সরকারের স্বীকৃত ব্যবস্থা এইরকম হল যে সুভাষচন্দ্র ওরল্যাণ্ডো মাৎসোটা এই নামে কাবুলের ইটালীয় দূতাবাসের একজন অফিসার সেজে ইটালীয় কূটনৈতিক পাশপোর্ট নিয়ে রাশিয়ার ভেতর দিয়ে যাবেন। কাবুল থেকে তাঁর যাত্রার প্রায় এক সপ্তাহ আগে শ্রীমতী কোয়ারোনি উত্তমচাঁদের দোকানে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি পৌঁছে দিলেন। মূল পাশপোর্টের ওপর মাৎসোটার ফোটোর বদলে সুভাষচন্দ্রের ফোটো লাগান হল। তাঁর জামাকাপড়ের অর্ডার দেওয়া হল। বোবা ও কালা পাঠান্ থেকে তাঁর ছদ্মবেশ ইটালীয় কূটনীতিবিদে রূপান্তরিত হল। ১৭ই মার্চ সুভাষচন্দ্র ইটালীয় দূতাবাসের ক্রেসিনির বাড়ীতে চলে গেলেন। পরের দিন সকালে সুভাষ তিনজন জার্মানের সঙ্গে একটি গাড়ীতে সোভিয়েট সীমান্তের

দিকে রওনা হলেন। যাবার পথে তিনি যখন হিন্দুকুশের উঁচু গিরিপথ দিয়ে এবং আফগানিস্তানের শুকনো গাছপালাহীন বিস্তীর্ণ অঞ্চল পার হচ্ছিলেন, তখন তিনি দু'রাত্রি জার্মানদের বাড়ীতে কাটিয়ে ছিলেন। আফগান সীমান্তে অক্সাস নদী পার হয়ে তাঁরা সমরখন্দ না পৌঁছনো পর্যন্ত গাড়ী থামল না। সমরখন্দ থেকে তাঁরা রেলে মস্কো গেলেন এবং সেখান থেকে প্লেনে ১৯৪১ এর গোড়ায় বার্লিন পৌঁছলেন।

১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ সন্ধ্যায় ভগত রাম তলোয়ার শরৎচন্দ্র বসুর কলিকাতার ১, উডবার্ণ পার্কের বাড়ীতে এলেন এবং শিশিরের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। শিশির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাবাকে নিয়ে এলেন। ভগত রাম তিনটি ডকুমেণ্ট নিয়ে এসেছিলেন—শরৎচন্দ্রকে বাংলায় লেখা সুভাষচন্দ্রের একটি ব্যক্তিগত চিঠি, একটি রাজনৈতিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ—'ফরওয়ার্ড ব্লক-এর যৌক্তিকতা' এবং 'আমার দেশবাসীর প্রতি বাণী', ১৯৪১ এর ২২শে মার্চ 'ইয়োরোপের কোথাও থেকে।' যখন তিনি কাবুলে আটকে পড়েছিলেন সেই সময় সুভাষচন্দ্র এগুলি লিখেছিলেন। পরের দিন সকালে ভগত রাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আবার দেখা করলেন এবং তাঁকে পেশোয়ার থেকে রাশিয়া সীমান্ত পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা বললেন। ভবিষ্যতের কাজের জন্য শরৎচন্দ্র প্রবীণ কংগ্রেসসেবী, বিপ্লবী এবং সুভাষচন্দ্রের বিশ্বস্ত অনুগামী সত্যরঞ্জন বক্সীর সঙ্গে ভগত রামের যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। বসু ভ্রাতৃদ্বয় ১৯৪১ এর নভেম্বর মাস পর্যন্ত কলিকাতার জাপানী কনসালেট জেনারেলের গোপন সহায়তায় টোকিওর সৌজন্যে বেতার বার্তা আদানপ্রদান করে যোগাযোগ রেখেছিলেন। বার্লিন যাওয়ার পথে মস্কোতে স্বল্পকাল থাকার সময় সোভিয়েট সরকার ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে কি যোগাযোগ হয়েছিল তা এখনও জানা যায়নি। কাবুলে লেখা তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিপ্লবী শক্তি বলে উল্লেখ করেছিলেন এবং অতীতে তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সোভিয়েটদের সক্রিয় সমর্থন, এমনকি সরাসরি হস্তক্ষেপ পর্যন্তও

চেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইয়োরোপ এবং পূর্ব এশিয়ায় সুভাষচন্দ্রের কার্যকলাপ তিনটি মূলসূত্র দিয়ে বুঝতে হবে—প্রথম তাঁর আদর্শগত প্রত্যয়, দ্বিতীয় সেই প্রত্যয়ের ভিত্তিতে তাঁর সুপরিকল্পিত লক্ষ্য এবং তৃতীয় বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সেই সুপরিকল্পিত লক্ষ্য সাধনে সবচেয়ে উপযোগী কৌশল। তাঁর আদর্শগত প্রত্যয়ের দুটি প্রতিপূরক উপাদান ছিল, যথা, পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা এবং তা অর্জন করার জন্য এবং সম্পূর্ণ আধুনিক এবং সমাজবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রস্তুত করতে অপোষহীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম। যে সুপরিকল্পিত লক্ষ্য তিনি সামনে রেখেছিলেন, তার ভিত্তি ছিল ভারতবর্ষে ইংরাজদের অবস্থার শক্ত ও দুর্বল দিকগুলির এবং অপরপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের শক্ত ও দুর্বল দিকগুলির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ওপর। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে বিপ্লবের জন্য ভারতবর্ষ প্রস্তুত, কিন্তু ভারতবর্ষের জাতীয় নেতৃত্ব, যার মধ্যে দক্ষিণ ও বাম পন্থী দুই-ই ছিল, ইংরাজদের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ভারতে ব্রিটিশ শাসন চালু রেখেছিল যে মূল শক্তি, যথা— ব্রিটিশ রাজ্যের বেতনভুক ও অনুগত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মি, সুভাষচন্দ্র ঐ পরিস্থিতিতে সেই শক্তির উপরই তাঁর পরিকল্পিত অভিযানের লক্ষ্য নিবদ্ধ করলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক যুদ্ধ সঙ্কটের সুযোগ গ্রহণ করে ভারতীয় ফৌজের সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আনুগত্য ধ্বংস করা এবং তার বদলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রতি নতুন আনুগত্য সৃষ্টি করা। তাঁর কৌশল ছিল ব্রিটেনের শত্রুদের অধিকৃত অঞ্চলগুলি কাজে লাগিয়ে বিপ্লবী মুক্তি ফৌজ গঠন করে যে কোন উপায়ে যে কোন পথে ভারতবর্ষে মুক্তি ফৌজকে প্রবেশ করানো।

জার্মানীতে পৌঁছবার এক সপ্তাহ পরে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ ও জার্মানীর সহযোগিতার পরিকল্পনাসহ একটি বিস্তৃত

স্মারকলিপি জার্মান সরকারকে দিলেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন ইয়োরোপে স্বাধীন ভারত সরকার গঠন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করলে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার প্রতিশ্রুতিসহ একদিকে জার্মানী ও ইটালী এবং অন্যদিকে স্বাধীন ভারত সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি। আফগানিস্থানে, উপজাতি অঞ্চলে এবং ভারতবর্ষের ভেতরে যে ধরণের কাজ করতে হবে তার একটি মোটামুটি খসড়াও তিনি তৈরী করলেন। অর্থের বিষয়ে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে বিদেশী শক্তিদের কাছ থেকে ধার হিসাবে প্রয়োজনীয় সাহায্য নেওয়া হবে, যুদ্ধের শেষে ভারতবর্ষের স্বাধীন সরকার তা শোধ করে দেবে। তিনি একটি সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার প্রস্তাবও করেছিলেন, যা একদিকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মির বিদ্রোহ এবং অন্যদিকে ঠিক সময়ে দেশের মধ্যে গণ অভ্যুত্থানকে এগিয়ে দেবে। ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে রেডিও প্রচারের সুযোগসুবিধাও তিনি চেয়েছিলেন। তিন সপ্তাহ পরে তিনি তাঁর মূল স্মারকলিপির সম্পূরক আর একটি সংযোজকও দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নে জার্মান সরকারের একটি খোলাখুলি ঘোষণার বিশেষ গুরুত্বের কথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের স্মারকলিপি জার্মান বিদেশ দপ্তরে তখনই কোন অনুকূল সাড়া জাগায়নি। যে সব ভারতীয় জার্মানীতে এবং অন্য ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে নির্বাসিতের জীবন যাপন করছিলেন অথবা ছাত্র ছিলেন, তাঁদের মধ্যে থেকে একটি মজবুত গোষ্ঠী সংগঠন করার কাজে তাই তিনি সময়ের সদ্ব্যবহার করলেন। বন্ধুবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং অনুগত ব্যক্তি সংগ্রহের জন্য তিনি ইটালী, ফ্রান্স এবং অষ্ট্রিয়ায় সফরও করলেন।

২৮

সুভাষচন্দ্রের বার্লিনে উপস্থিতি জার্মান সরকারের অথবা নাৎসী পার্টির উপর তলার ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি না করলেও,

ভাগ্যক্রমে জার্মান বিদেশ দপ্তরের সদ্য স্থাপিত তথ্য বিভাগের সদস্যদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া অন্যরকম হয়েছিল। এই বিভাগে পেশাগত কূটনীতিবিদরা ছাড়াও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন, যাঁদের ব্রিটেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের জন্য নেওয়া হয়েছিল। এই বিভাগের পরিচালনার ভার ছিল অ্যাডাম ফন্ ট্রটের ওপর; তিনি ছাত্রাবস্থায় অক্সফোর্ডে ছিলেন এবং ভারতের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁর সহকারী ছিলেন আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ, যিনি ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টারী পাশ করেছিলেন এবং ভারতবর্ষের ব্যাপারে যাঁর গভীর এবং সহানুভূতিশীল আগ্রহ ছিল। এই তু'জন ভদ্রলোক সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর আশাআকাঙ্ক্ষায় সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাঁর কাজে যতদূর সম্ভব সাহায্য করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের কাজ ছিল সুভাষচন্দ্রের সাহায্য নিয়ে জার্মান সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে অবহিত করা এবং এশিয়ার জনগণের প্রতি তাঁরা মনে মনে যে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন সেটা দূর করার চেষ্টা করা। তাঁরা কৌশলে সুভাষচন্দ্র এবং নাৎসী পার্টির সদস্যদের মধ্যে যাতে কোন অপ্রীতিকর যোগাযোগ না হয় তাও দেখতেন। তাঁদের প্রথম কাজ হল সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব, সম্মান এবং ভারতবর্ষে তাঁর প্রতিষ্ঠা অনুযায়ী তাঁর জন্য যথাযোগ্য পদ মর্যাদা আদায় করা।

১৯৪১ সালের মাঝামাঝি থেকে একটি বিশেষ ঘটনা সুভাষচন্দ্রের অনুকূলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাল। ইয়োরোপে বসবাসকারী ভারতীয়েরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় জার্মানীতে প্রবেশ করছিলেন এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে প্রচুর ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের জার্মানীতে আনা হচ্ছিল। জার্মানরা দেখল যে এইসব লোকের মানসিকতা মূলতঃ ইংরাজ-বিরোধী; কিন্তু জার্মানরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এদের নিজেদের অনুকূলে কাজে লাগাবার কোন চেষ্টা করল না। সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতি এবং তথ্য বিভাগের তাঁর বন্ধুদের পরামর্শ জার্মান

সামরিক নেতাদের এবং জার্মান বিদেশ দপ্তরে পরিস্থিতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে নতুন সচেতনতা জাগাল। বিদেশ দপ্তরের তথ্য বিভাগে খুব শীঘ্র একটি 'ওয়ার্কিং গ্রুপ ইণ্ডিয়া' গড়ে তোলা হল যেটি পরে ফন্ ট্রট এবং ওয়ার্থের অধীনে 'স্পেশাল ইণ্ডিয়া ডিপার্টমেণ্টে' রূপান্তরিত হয়। ক্রমে ক্রমে জার্মান বিদেশ দপ্তরে এবং জার্মান সামরিক কম্যাণ্ডে সুভাষচন্দ্রের বন্ধুগোষ্ঠী বাড়তে লাগল। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে সুভাষচন্দ্র অসাধারণ দৃঢ়তা ও ইচ্ছাশক্তির অধিকারী এবং তাঁর আন্তরিকতা ও সততা সব প্রশ্নের ঊর্ধে। তাঁরা আরও বুঝেছিলেন যে তিনি কখনও নাৎসী পার্টির তথাকথিত উচ্চপদস্থ নেতাদের কোন খেয়ালের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি কখনও কোন আপোষ করবেন না।

১৯৪১ এর জুন মাসের শেষে জার্মানী যখন সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করল, সুভাষচন্দ্র তখন রোমে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জার্মান বিদেশ দপ্তরকে জানালেন যে ভারতবাসীর দৃষ্টিতে জার্মানী হল আগ্রাসী এবং ভারতবাসীদের সহানুভূতি থাকবে রুশদের প্রতি, কারণ তাঁরা সোভিয়েট রাশিয়াকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি বলে মনে করতেন। তাঁর স্মারকলিপিতে তিনি জার্মানদের একথাও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য তাঁর পরিকল্পনা রূপায়নে সোভিয়েট রাশিয়ার পরোক্ষ সাহায্য বাঞ্ছনীয় হবে।

জার্মানীর এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে অনাক্রমণের যে স্থিতাবস্থা ছিল তার ওপর ভিত্তি করে তিনি উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ভারতবর্ষের উপর সশস্ত্র অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন। তা যখন হল না, তিনি তাঁর সুপরিকল্পিত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও যতটা সম্ভব করতে চেয়েছিলেন। ১৯৪১ সালের শেষের দিকে তিনি বার্লিনে 'ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার' স্থাপনা করলেন। সহযোগী হিসাবে তিনি বেশ কয়েকজন খুব যোগ্য ও দেশপ্রেমিক ভারতীয়কে পেয়েছিলেন ; তাঁদের মধ্যে ছিলেন এ. সি.

এন. নাম্বিয়ার, এন. জি. গণপুলে, আবিদ হাসান, এন. জি. স্বামী, এম. আর. ব্যাস, গিরিজা মুখার্জী প্রমুখ। ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার বিদেশী কূটনৈতিক মিশনের মর্যাদা লাভ করেছিল এবং ফলে এর সদস্যরাও বিশেষ সুযোগ সুবিধা পেতেন। ঐ কেন্দ্রের কার্যকলাপ নিম্নলিখিত বিভিন্ন ধারায় চলত :

(ক) 'আজাদ হিন্দ রেডিও', 'ন্যাশনাল কংগ্রেস রেডিও', 'আজাদ মুশ্লিম রেডিও' মারফৎ অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা

(খ) 'আজাদ হিন্দ' নামে জার্মানী ও ইংরাজী দ্বিভাষী একটি পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ ; পত্রিকাটি সারা ইয়োরোপে প্রচারিত হত এবং এতে থাকত ভারতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, দর্শন শিল্প প্রভৃতি সম্ভাব্য সব বিষয়ের রিপোর্ট ও রচনাদি

(গ) জার্মানীতে বসবাসকারী ভারতীয়দের দেখাশোনা করা ও সংগঠিত করা

(ঘ) ইয়োরোপের সব দেশের ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের কার্যকলাপের সমন্বয় সাধন

(ঙ) উত্তর আফ্রিকা থেকে আগত যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে গঠিত ইণ্ডিয়ান লিজন বা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা, সমন্বয় সাধন ও স্বার্থ সংরক্ষণ

(চ) দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সঙ্গে সমন্বয়ের একটি কেন্দ্র গঠন—১৯৪২ এর ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি সিঙ্গাপুরের পতনের পর এর গুরুত্ব বেশ বেড়ে যায়।

স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার একটি পরিকল্পনা কমিশনও গঠন করেছিল। সেণ্টার কংগ্রেসের তিনরঙার উপর বাঘের ছবি দিয়ে নিজস্ব প্রতীক প্রস্তুত করেছিল ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জনগণমন' গানটি জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং সাম্প্রতিক ভারতীয় ইতিহাসে এই প্রথম 'জয় হিন্দ' সর্বভারতীয় ও সার্বজনীন অভিবাদন হিসাবে চালু করা হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র ঐ সময় থেকেই

'নেতাজী' আখ্যা পান। এই নামে স্নেহ ও সম্মান দুয়ের সমন্বয় ছিল। সিঙ্গাপুরের পতনের পরেই ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে বেতার প্রচার সুরু করেন। তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে তিনি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—'ভারতের মুক্তির সময় এসে গেছে। ভারত এবার জেগে উঠবে এবং যে শৃঙ্খল তাঁকে এতদিন বেঁধে রেখেছিল, সেই শৃঙ্খল মোচন করবে। ভারতের স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে এশিয়া এবং পৃথিবী মানবজাতির মুক্তির বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে।'

ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ছিল সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী। ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা জাগিয়ে এবং তারই ভিত্তিতে তাদের ভর্তি করা হত এবং নেতাজী নিজে প্রায়ই এই শিক্ষার ভার নিতেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু, শিখ, মুসলমান, পাঞ্জাবী, মারাঠী, বাঙ্গালী প্রভৃতি সব সম্প্রদায়কে একসূত্রে এক সাথে সংগঠিত করা হয়েছিল।

সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ভারতীয় লিজনের বিপ্লবাত্মক ভূমিকা পালনের সম্ভাবনা নষ্ট করে দিয়েছিল। যাই হোক, ১৯৪৪ সালে যখন ইঙ্গ-আমেরিকার সেনারা ফ্রান্সে নেমেছিল, ভারতীয় লিজন তখন বীরত্বের সঙ্গে লড়েছিল।

১৯৪১ এর ডিসেম্বর মাসে দূর প্রাচ্যে যুদ্ধ সুরু এবং জাপানী সেনাবাহিনীর দ্রুত ও চমকপ্রদ অগ্রগতির ফলে ১৯৪২ এর ফেব্রুয়ারী মাসে সিঙ্গাপুরের পতন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন দিগন্ত খুলে দিল। নেতাজী সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্যে চলে আসার কথা এবং পূর্ব প্রান্ত থেকে ভারতবর্ষে সশস্ত্র অভিযানের কথা ভাবতে সুরু করলেন। জাপানী সেনা যখন বার্মায় ভারতের প্রবেশপথে এসে দাঁড়িয়েছে ১৯৪২ সালের মে মাসে তিনি জার্মান বিদেশ মন্ত্রীকে চিঠিতে লিখলেন —'ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মুক্তি সাধনের জন্য চূড়ান্ত সংগ্রামের সময় এসে গেছে। এইজন্য প্রাচ্যে আমার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।'

এদিকে ভারতবর্ষে ১৯৪২ এর এপ্রিল-মে মাসে মহাত্মা গান্ধীর

অনুপ্রেরণায় স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গিয়ে যুদ্ধকালীন আপোষের জন্য তথাকথিত ক্রিপস প্রস্তাব কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করল। উপরন্তু সুভাষচন্দ্রের আনন্দের কারণ আরও হল যে মহাত্মা গান্ধী ইংরাজদের সঙ্গে শেষ সংগ্রামের দিকেই এগোচ্ছিলেন। কংগ্রেসের জন্য তাঁর মূল খসড়া প্রস্তাবে গান্ধীজী বলেছিলেন—'ইণ্ডিয়ান আর্মির সঙ্গে আমাদের কোন যোগসূত্র নেই তারা ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না, ভারতবাসীরা কোনভাবেই ফৌজটিকে তাদের নিজেদের বলে মনে করতে পারে না। জাপানের বিবাদ ভারতবর্ষের সঙ্গে নয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে জাপানের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করাই বোধ হয় আমাদের প্রথম কাজ হবে।' এইভাবে ইতিহাসের অনমনীয় যুক্তিতে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের দুটি প্রধান ধারা ক্রমশঃ একে অপরের কাছাকাছি আসতে আসতে ১৯৪২ এর আগষ্ট মাসে একটি বিরাট রাজনৈতিক অভ্যুত্থানে মিশে গেল এবং ১৯৪৪ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বপূর্ণ অভিযানে তার পরিসমাপ্তি হল।

১৯৪২ সালের মে মাসের শেষে নেতাজী হিটলারের সঙ্গে প্রথম ও শেষবারের মত দেখা করেছিলেন। তিনি এই সাক্ষাতকারে সন্তুষ্ট হননি, কিন্তু হিটলার যে নেতাজীকে প্রাচ্যে যাবার জন্যে সুযোগ সুবিধা করে দেবার সিদ্ধান্তটি মেনে নিয়েছিলেন, এটি একটি সুনির্দিষ্ট লাভ হয়েছিল। ফলে সাবমেরিণে জার্মানী থেকে দূর প্রাচ্যে জলযাত্রা—নেতাজীর আর একটি বিপদসঙ্কুল ভ্রমণের নিশ্ছিদ্র এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য জার্মান এবং জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে দীর্ঘ ও অতি গোপন আলোচনা সুরু হল।

## ২৯

১৯৪৩ সালের ২৬শে জানুয়ারী বার্লিনে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হল; ঐ অনুষ্ঠানে নেতাজী প্রধান ভাষণ দিয়েছিলেন। দু'দিন পরে তিনি শেষবারের মত আজাদ

হিন্দ্ বাহিনীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তারপর তাঁকে আর ইয়োরোপে দেখা যায় নি। ১৯৪৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি আবিদ হাসানকে সঙ্গে নিয়ে উত্তর জার্মান বন্দর কীল এ গিয়ে পৌঁছলেন; সেখানে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন বিদেশ দপ্তরের সেক্রেটারী অব ষ্টেট কেপ্লার, নাম্বিয়ার এবং ওয়ার্থ।

অজানার উদ্দেশ্যে তাঁর দ্বিতীয় অভিযান সুরু করার আগে নেতাজী তাঁর নিজের হাতে লেখা একটি মর্মস্পর্শী বার্তা রেখে গিয়েছিলেন—তাঁর মেজদাদা শরৎচন্দ্রকে বাংলায় লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন যে তিনি অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল এক যাত্রা সুরু করছেন এবং শেষ পর্যন্ত বাঁচবেন কিনা তার ঠিক ঠিকানা নেই। তিনি আরও লিখেছিলেন যে তাঁর মেজদাদা তাঁর অবর্তমানে যেন তাঁর স্ত্রী ও কন্যা, যাঁদের তিনি ইয়োরোপে রেখে যাচ্ছেন, তাঁদের প্রতি সমান স্নেহ ও সহৃদয়তা দেখান, যা তিনি সারাজীবন তাঁর প্রতি দেখিয়েছেন।

৯ই ফেব্রুয়ারী ভোর রাত্রে অধিনায়ক মুসেনবার্গ নেতাজী ও হাসানকে সাবমেরিণে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁরা দু'জন জাহাজে ঢোকামাত্র দরজা বন্ধ হয়ে গেল এবং সাবমেরিণটি জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল। সাবমেরিণটি ছিল ছোট মাপের। ভেতরে ডিজেল তেলের গন্ধে চারিদিকে দমবন্ধ করা পরিবেশ। চলাচলের জায়গার একধারে ছোট এক কোণে নেতাজীর স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। এমন কি খাবারেও ডিজেল তেলের দুর্গন্ধ। এই পরিবেশে নেতাজীকে তিন-মাস কাটাতে হয়েছিল। সাবমেরিণটি প্রথমে ডেনমার্কের কূল দিয়ে গিয়ে নরওয়ের সমুদ্র উপকূল এবং উত্তর সাগর পার হয়ে শেষে অতলান্তিক মহাসাগরে পৌঁছল। গোড়ার দিকে সাবমেরিণের একটি দল এবং একটি মাইন সুইপার এটিকে রক্ষা করছিল; কিন্তু জার্মান-নিয়ন্ত্রিত জলপথ পার হয়ে যাবার পর সাবমেরিণটি জল থেকে এবং বিমান থেকে শত্রু পক্ষের আক্রমণের সহজ শিকার ছিল। প্রতি রাত্রে এর ব্যাটারীগুলি চার্জ করে নেবার জন্য সাবমেরিণটিকে জলের উপরে আসতে হত। দিনের বেলায় সমুদ্রের তলা দিয়ে এটি নিজের পথ

ধরে এগোত। যাত্রা সুরু করার আগেই নেতাজীকে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছিল যে এই যাত্রায় তিনি নিজের দায়িত্বেই যাবেন এবং যাত্রা যে নিরাপদ হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তিনি বিনা দ্বিধায় এই এই শর্ত মেনে নিয়েছিলেন।

সাবমেরিণে অত্যন্ত কষ্টকর অবস্থাতেও নেতাজী একদিনের জন্যও বিশ্রাম গ্রহণ করেন নি। প্রথম দিন থেকেই তিনি পূর্ব এশিয়ায় আসন্ন সংগ্রাম সম্বন্ধে তাঁর যে বিভিন্ন পরিকল্পনা ছিল সেগুলি নিয়ে কাজ সুরু করে দিয়েছিলেন। এ সবই তিনি করতেন খুঁটিনাটি সব দিক বিচার করে এবং দক্ষতার সঙ্গে। একদিন তিনি যখন তাঁর অতি প্রিয় পরিকল্পনা ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর সংগঠন নিয়ে কাজ করছিলেন, তখন শত্রুপক্ষের একটি মালবাহী জাহাজ দেখা গেল এবং জাহাজটিকে আক্রমণ করার হুকুম দেওয়া হল; কিন্তু নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত লোকটির ভুলের জন্য সাবমেরিণটি জলের ওপরে উঠে এল। সাবমেরিণটি দেখতে পেয়ে মালবাহী জাহাজটি সঙ্গে সঙ্গে দিক পরিবর্তন করে সাবমেরিণটিকে আঘাত করার জন্য দ্রুতবেগে তার দিকে এগিয়ে এল। ক্যাপ্টেন সাবমেরিণটিকে জলের তলায় নিয়ে যাবার জন্য চেঁচিয়ে হুকুম দিতে লাগলেন; কিন্তু আগের ভুলটির জন্য তাঁর হুকুম সঙ্গে সঙ্গে পালন করা সম্ভব হল না। মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য সাবমেরিণটি সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল এবং স্বাভাবিকভাবেই সকলেই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। এতগুলি মানুষের ওপর যখন মৃত্যুর ছায়া নেমে এসেছিল এবং বলা যায় হাসানের হৃৎস্পন্দন প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল, নেতাজী তখন বেশ জোর গলায় দৃঢ়ভাবে বললেন—'হাসান, আমি তোমাকে একটি পয়েণ্ট দু'বার বলেছি, কিন্তু তবুও তুমি নোট করে নাও নি।' সাবমেরিণটি সবে জলের নীচে নেমেছে, তখন শত্রুপক্ষের জাহাজটি সাবমেরিণটিকে একটি প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে তার ওপর দিয়ে গর্জন করে চলে গেল। ক্যাপ্টেন পরে নাবিকদের সম্বোধন করে বলেছিলেন যে এমনকি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও হঠাৎ সংকটের সময় কি ভাবে শান্ত ধীর থাকতে হয়, তাঁদের বিশিষ্ট ভারতীয় অতিথি ও তাঁর সাথীর কাছে

থেকে তাঁদের সকলের শেখা উচিত।

শত্রুদের জাহাজ এবং এরোপ্লেনগুলিকে অগ্রাহ্য করে সাবমেরিণটি অতলান্তিক মহাসাগরের ভেতর দিয়ে 'কেপ অফ্ গুড হোপ' ঘুরে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করল। মাদাগাস্কারের প্রায় চারশ নৌ-মাইল দক্ষিণ দক্ষিণ-পশ্চিমে মোজাম্বিক প্রণালীতে একটি জাপানী সাবমেরিণের সঙ্গে মিলিত হবার কথা আগে থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে ছিল। জাপানী 1-29 সাবমেরিণটি পেনাঙ থেকে নির্দিষ্ট দিনের প্রায় বার ঘণ্টা আগে ঐ জায়গায় এসে পৌঁছেছিল। জাপানী সাবমেরিণটির অধিনায়ক ছিলেন জুইচি ইজু। কয়েক ঘণ্টা ধরে ঘোরাঘুরি করবার পর ছোট জার্মান সাবমেরিণটিকে জমাট অন্ধকার থেকে উঠে আসতে দেখা গেল। উভয় পক্ষকেই সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল; কিন্তু তারপর যখন উষা হল সমুদ্র তখন অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ থাকায় ছুটি সাবমেরিণ কাছাকাছি আসা অসম্ভব ছিল। রেডিওতে বার্তা-বিনিময়েও খুব ঝুঁকি ছিল। শেষে মরিয়া হয়ে জার্মান সাবমেরিণ থেকে ছ'জন নাবিক সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে জাপানী সাবমেরিণে গিয়ে উঠল। ছুটি সাবমেরিণের মধ্যে হাত দেখিয়ে সঙ্কেত বিনিময় হল। কিন্তু সমুদ্র তখনও উথাল পাতাল করছিল। অবশেষে ছুই জার্মান একটি শক্ত শনের দড়ি ধরে টানতে টানতে একটি রবারের ভেলায় চড়ে তাদের সাবমেরিণে ফিরে গেল। নেতাজী এবং হাসান রবারের ভেলায় উঠে দড়িটি আঁকড়ে ধরে উত্তাল তরঙ্গ এবং হাঙ্গরদের হাতছানি উপেক্ষা করে একটু একটু করে এগিয়ে পার হলেন। ২৮শে এপ্রিল এক ডুবোজাহাজ থেকে অন্যটিতে স্থানান্তর সম্পন্ন হল এবং বার্লিনে জরুরী রেডিও বার্তা পাঠান হল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমগ্র ইতিহাসে শত্রুর বিমান এবং নৌশক্তির কর্তৃত্বাধীন সমুদ্রপথে এক সাবমেরিণ থেকে অন্য সাবমেরিণে যাত্রী স্থানান্তরের এটিই একমাত্র ঘটনা। ব্রিটিশ টহলদারী এলাকা ছেড়ে যাবার পর জাপানী সাবমেরিণটি পেনাঙ থেকে একটি রেডিও বার্তা পেল—সুমাত্রার উত্তরে সমুদ্রতীর থেকে দূরে সাবাঙ নামে একটি ছোট

দ্বীপে যাত্রীদের নামিয়ে দিতে হবে। সাবাঙে নেতাজীকে ও হাসানকে রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ক'দিন আলাদা করে রাখা হল এবং তাঁরা বিশ্রামও নিলেন। ১৯৪৩ সালের ১৩ই মে তাঁদের বিমানে টোকিও পৌঁছে দেওয়া হল এবং বিখ্যাত ইম্পিরিয়াল হোটেলে রাখা হল।

তাঁর দীর্ঘ সাবমেরিণ যাত্রার সময় নেতাজী প্রথমতঃ জাপানের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলার জন্য নিজের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করলেন এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁর সামনে প্রধান যে কর্তব্য, যথা, ব্রিটেনের সঙ্গে স্বাধীনতার যুদ্ধ সুরু করা তার জন্য পথের সব সমস্যাগুলি দূর করে এশিয়ায় বসবাসকারী বিক্ষিপ্ত ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত ভারতীয়দের নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল এবং সংগ্রামশীল সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা স্থির করে ফেললেন।

প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য নেতাজী পুরো একমাস সময় নিয়েছিলেন। জাপানের সামরিক বাহিনীর সব প্রধানদের সঙ্গে নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিজ্ঞ বুদ্ধিজীবী এবং জনজীবনে প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাত করলেন। শিল্পোদ্যোগ, খামার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং মানবিক জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানও তিনি পরিদর্শন করেছিলেন। একটা কিম্বদন্তী আছে যে ১৯৪৬ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি প্রথম সাক্ষাতেই তোজো সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যক্তিত্বে সম্পূর্ণ অভিভূত হন এবং তাঁর অধিকাংশ দাবীগুলিই মেনে নেন। তাঁদের দুটি সাক্ষাতকারের পর তোজো নেতাজীকে জাপানের পার্লামেন্টে আমন্ত্রণ জানান এবং সেখানে তাঁর উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে সম্পূর্ণ এবং শর্তহীন সমর্থন দেবার কথা সরকারীভাবে ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের তরফ থেকে এই ধরণের ঘোষণা আর একটিও হয়নি। নেতাজী নাৎসী জার্মানীর কাছ থেকে এ ধরণের কোন ঘোষণা আদায় করতে পারেন নি, যুদ্ধের মধ্যে কোন সময় গান্ধীজী বা অন্যান্য ভারতীয় নেতারা ইংরাজ সরকার বা

তাদের কোন মিত্র রাষ্ট্রের কাছ থেকে এই ধরণের প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পারেন নি।

প্রথম দফায় জয়লাভ করে নেতাজী জাপানে তাঁর উপস্থিতির কথা বিশ্বের কাছে প্রকাশ করলেন। খবরটি সারা এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যে শিহরণ এবং শত্রুশিবিরে আতঙ্ক সঞ্চার করল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আসন্ন অভিযানে সক্রিয় এবং অকুণ্ঠ সমর্থন চেয়ে তিনি বেতারে পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী তাঁর দেশবাসীর কাছে উদ্দীপনাময় আবেদন প্রচার করলেন। এই বেতার ভাষণে তিনি বলেছিলেন—"আমার দেশবাসীরা এবং আমার স্বদেশের ভাই বোনেরা যে পরিস্থিতির মধ্যে আছেন, তার মধ্যে তাঁরা যথাসাধ্য করছেন। কিন্তু আমাদের শত্রুপক্ষ নির্মম ও বেপরোয়া এবং তারা পুরোপুরি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। এরকম বর্বর শত্রুর বিরুদ্ধে আইন অমান্য অথবা অন্তর্ঘাত অথবা বিপ্লবাত্মক সন্ত্রাসবাদ যাই করা হোক না কেন, বিশেষ ফল হবে না। শত্রুরা ইতিমধ্যেই অস্ত্রধারণ করেছে, সুতরাং অস্ত্রের সাহায্যেই তাদের সঙ্গে লড়তে হবে। কিন্তু দেশের মধ্যে আমাদের দেশবাসীর পক্ষে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লব করা এবং ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই দায়িত্ব এসে পড়েছে বিদেশে এবং বিশেষ করে পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের ওপর···

"কালের আহ্বান শোনা যাচ্ছে! প্রত্যেক দেশপ্রেমিক ভারতবাসীকে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগোতে হবে। স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীদের রক্তের বিনিময়েই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করবে!"

১৯৪৩ সালের ৩রা জুলাই নেতাজী প্রবীণ ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সিঙ্গাপুরে পৌঁছলে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির অফিসাররা ও জওয়ানরা এবং ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের নেতারা তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানালেন।

নেতাজীর এসে পৌঁছবার এক বছর আগে থেকে প্রবাসী দেশপ্রেমী ভারতীয়রা পূর্ব এশিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। মোহন সিংয়ের উদ্যোগে এবং তেজস্বী তরুণ জাপানী অফিসার ইওয়াইচি ফুজিওয়ারার দৃঢ় সমর্থনে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিও গঠিত হয়েছিল। রাসবিহারী বসু ছিলেন ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের নেতৃত্বে এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির নিয়ন্ত্রণে ছিলেন মোহন সিং। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নেতৃত্বের কিছুটা অক্ষমতায় এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞতার জন্য আন্দোলনটি ভেঙ্গে পড়েছিল। নেতাজী যখন পৌঁছলেন, সবই ছিল অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় এবং ফৌজটিকে সাময়িকভাবে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। নেতাজী পূর্ব এশিয়ায় স্বাধীনতার আন্দোলন আবার সংগঠিত ও পুনর্বিন্যস্ত করে শক্তিশালী করার জন্য একটানা অক্লান্ত ও যুগান্তকারী অভিযান সুরু করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আজাদ হিন্দ ফৌজকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজাবার কাজও আরম্ভ করলেন।

১৯৪৩ সালের ৪ঠা জুলাই সারা পূর্ব এশিয়ার প্রতিনিধিদের নিয়ে সিঙ্গাপুরে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে এবং খুব উঁচু মানের প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে রাসবিহারী বসু সমগ্র আন্দোলনের নেতৃত্বভার নেতাজীর হাতে তুলে দিলেন। লীগের সভাপতি হিসাবে তাঁর ভাষণে নেতাজী ভারতবর্ষে ভারতীয় জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের উল্লেখ করে পূর্ব এশিয়ার ভারতবাসীদের সামনে যে কর্তব্য সে সম্বন্ধে বলেন। তিনি বললেন—'ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আগষ্ট ১৯৪২ নিষ্ক্রিয় থেকে সক্রিয় প্রতিরোধে রূপান্তরের অবিস্মরণীয় সন্ধিক্ষণ হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং এখন আমাদের অভিযানের পরবর্তী ধাপে উন্নীত হবার সময় এসেছে। ইংরাজ

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাই হবে আমাদের এই সংগঠনের উদ্দেশ্য।' নেতাজীর বাগ্মিতায় শ্রোতারা মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি সোজাসুজি স্পষ্ট ভাষায় বলতেন এবং তাঁর কথা মানুষের হৃদয় ও মন স্পর্শ করত। তিনি সহজ করে তাঁর বিপ্লবী জীবনের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার কথাও বলেছিলেন। তিনি তাঁদের বলেছিলেন যে স্বাধীনতার জন্য শেষ সংগ্রামে আমাদের দুটি জিনিষের প্রয়োজন—প্রথমটি হল মুক্তি ফৌজ এবং দ্বিতীয়টি হল অস্থায়ী স্বাধীন সরকার, যার নেতৃত্বে সেনাবাহিনী যুদ্ধ করবে। পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা তাঁদের নির্বাচিত নেতার আহ্বানে বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। ১৯৪২ সালে যে জাতীয় তিন-রঙা পতাকা ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ পদদলিত করেছিল, পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা সেই পতাকা আবার হাতে তুলে নিলেন এবং স্বাধীনতার যুদ্ধ আবার সুরু হল।

সংগ্রামে চূড়ান্ত জয়লাভের জন্য নেতাজী লোকবল, অর্থ এবং সাজসরঞ্জাম সব কিছু পুরোপুরি মুক্তিযজ্ঞে দান করার দাবী তুলেছিলেন। পূর্ব এশিয়ায় তাঁর দেশবাসী তাঁর ডাকে যে বিপুল সাড়া দিয়েছিলেন, ১৮৫৭ সাল থেকে আরম্ভ করে দেশের সংগ্রামের ইতিহাসে তা ছিল অভূতপূর্ব। আমরা দেখলাম এক সুরে বাঁধা প্রবাসী একটি জাতির এক বিরাট কর্মকাণ্ড—নারী পুরুষ, যুবা বৃদ্ধ, সৈনিক, শ্রমিক, কৃষক, ব্যবসায়ী বিভিন্ন পেশাজীবী, সকলেই দেশমাতৃকার সঙ্গে নিজেদের সত্ত্বা মিশিয়ে দিয়ে তাঁর মুক্তির জন্য যার যা ছিল সর্বস্ব দিয়ে দিল।

১৯৪৩ সালের ৫ই জুলাই দিনটিকে নেতাজী বলেছিলেন—'আমার জীবনের আজ সবচেয়ে গর্বের দিন', কারণ সেই দিন তিনি প্রথম সিঙ্গাপুরের টাউন হলের বিপরীত দিকের বিরাট মাঠে সর্বাধিনায়ক হিসাবে যুদ্ধের সাজে সজ্জিত আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিদর্শন করেন। তাঁর সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন—

'সশস্ত্র সংগ্রাম করে এবং রক্তের বিনিময়ে তোমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। তারপর, ভারত স্বাধীন হলে স্বাধীন ভারতবর্ষের

একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী তোমাদের গড়ে তুলতে হবে, যার কাজ হবে চিরকালের জন্য সেই স্বাধীনতা রক্ষা করা। আমাদের জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এমন অটল ভিত্তির ওপর গড়ে তুলতে হবে, যাতে ইতিহাসে আর কখনও যেন আমরা স্বাধীনতা না হারাই।'

'আমাদের পরাধীনতার জন্য আমাদের অনুপ্রাণিত করবার মত মুকডেন, পোর্ট আর্থার বা সিডানের মত ঐতিহ্য নেই,···তোমাদের মধ্যে থেকেই স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনীর ভবিষ্যত 'জেনারেল ষ্টাফ' জন্মগ্রহণ করবে'···

'আমি তোমাদের আশ্বাস দিতে পারি যে অন্ধকারে ও আলোকে, দুঃখে ও আনন্দে, দুর্যোগে ও বিজয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব।··· আমি তোমাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কষ্ট, বিরামহীন সংগ্রাম এবং মৃত্যু ছাড়া কিছুই দিতে পারি না। কিন্তু তোমরা যদি আমাকে জীবনে ও মরণে অনুসরণ কর, আমি তোমাদের নিয়ে যাব বিজয়ের এবং স্বাধীনতার পথে···'.

'হে আমার সৈনিকবৃন্দ! তোমাদের রণ-ধ্বনি হোক—চল দিল্লী! চল দিল্লী! আমাদের মধ্যে ক'জন এই স্বাধীনতার যুদ্ধের পর জীবিত থাকব, আমি জানি না। কিন্তু আমি এটা জানি যে শেষপর্যন্ত আমরা জয়লাভ করব এবং আমাদের কর্তব্য শেষ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের বিজয়ী বীরেরা ইংরাজ সাম্রাজ্যের আর একটি সমাধিস্থল—প্রাচীন দিল্লীর লাল কেল্লায় বিজয়ের কুচকাওয়াজ করবে।'

পরের তিনমাস নেতাজী অক্লান্ত পরিশ্রম করলেন। পূর্ব এশিয়ার বিস্তৃত এলাকায় বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায়কে জাতীয়তার নতুন ভাবাদর্শে ও দেশপ্রেমে উদ্দীপিত করার জন্য এবং মুক্তি আন্দোলনের ভার নেবার জন্য সিঙ্গাপুরে সদর দপ্তর করে একটি সুশৃঙ্খল সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি ব্যাপকভাবে সফর করলেন। ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে এক ঐতিহাসিক সমাবেশে তিনি সরকারীভাবে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার ঘোষণা করলেন। তিনটি বিশ্বশক্তি—জাপান, জার্মানী এবং ইটালী সহ ন'টি রাষ্ট্র এই অস্থায়ী

সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। দু'শ বছরের মধ্যে এই প্রথম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তার আস্বাদ পেলেন। অস্থায়ী সরকারের প্রথম কাজ হল ব্রিটেন এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা ; কারণ আমেরিকা ছিল ভারতের মাটিতে যুদ্ধে ব্রিটেনের সক্রিয় সহায়ক। আজাদ হিন্দ সরকার বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছিল অক্ষশক্তিদের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় কোন ভাগ নেওয়ার দায়িত্ব অস্বীকার করে। উপরন্তু এই সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছিল যে যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের স্থায়ী সরকার গঠিত হবে 'ভারতের জনগণের ইচ্ছা অনুসারে।'

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণা পত্রটি একটি স্মরণীয় দলিল। নেতাজী একদিন সারা রাত্রি জেগে মাঝে মাঝে কফিতে চুমুক দিয়ে এটি লিখেছিলেন। সরকার ঘোষণা করার পর নেতাজী রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। সেই মুহূর্তটি এতই আবেগভারাক্রান্ত ছিল যে তিনি নিজেকে সামলাতে পারেন নি এবং তাঁর দু'গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়েছিল।

১৯৪৩ সালের ২২শে অক্টোবর নেতাজী আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের ঝাঁসীর রাণী বাহিনী প্রতিষ্ঠা করলেন। ভারতের মহিলা যোদ্ধাদের এই বাহিনীটি নারী ও পুরুষের সমান অধিকারে নেতাজীর বিশ্বাস এবং জীবনের সব বিভাগে এবং মানবিক উদ্যোগে নারীদের সমান ও পূর্ণ সুযোগ দেবার তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্পের বাস্তব প্রকাশ।

১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে নেতাজী টোকিওতে বৃহত্তর পূর্ব এশীয় সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। ঐ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নেতাজী একজন পর্যবেক্ষক হিসাবে থাকবেন ঠিক করেছিলেন, কারণ, প্রথমতঃ ভারতবর্ষ তখনও স্বাধীনতা অর্জন করেনি, দ্বিতীয়তঃ জাপান এবং তার বৃহত্তর পূর্ব এশীয় সহ-উন্নয়ন মণ্ডলের মিত্রদের যুদ্ধোত্তর কোন পরিকল্পনায় বা ব্যবস্থায় স্বাধীন ভারতের পক্ষ থেকে তিনি কোন কথা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না ; কিন্তু তা সত্ত্বেও কেবল তাঁর

ব্যক্তিত্বের জোরে, তেজী স্বাধীনচিত্ততায়, আন্তরিকতায় এবং বাগ্মিতায় তিনি সম্মেলনে সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। সভায় তাঁর ঐতিহাসিক অভিভাষণে তিনি পৃথিবীর পরাধীন জাতিগুলির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পর্যালোচনা করেছিলেন এবং ন্যায়বিচার, জাতীয় সার্বভৌমত্ব, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সমতা এবং পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীতে এক নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। সম্মেলনের শেষের দিকে ব্রহ্মদেশের ডঃ বা ম কর্তৃক উত্থাপিত একটি প্রস্তাবে 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন' জানান হয়েছিল এবং প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল। সম্মেলনে সবশেষে প্রধানমন্ত্রী তোজো ঘোষণা করেছিলেন যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, যা তখন জাপানী সামরিক অধিকারে ছিল, অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারকে হস্তান্তরিত করা হবে।

ডিসেম্বরে সিঙ্গাপুরে ফিরে যাবার আগে নেতাজী চীন, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া সফর করলেন। প্রত্যেক দেশেই তাঁকে রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মানসহ সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। চীনে তিনি নান্‌কিং-এর কাছে সুন্-ইয়াৎ-সেনের সমাধি পরিদর্শন করে চীন বিপ্লবের জনকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

## ৩১

১৯৪৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের প্রথম মুক্ত এলাকার ভার গ্রহণ করার জন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আন্দামান পৌঁছলেন। রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে তিনি জিমখানা ময়দানে বিশাল এক জনতার উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। তিনি ফরাসী বিপ্লবের সময় ব্যাষ্টিল-এর পতনের সঙ্গে আন্দামানের মুক্তির তুলনা করেছিলেন। ইংরাজরা যেখানে শত শত ভারতীয় মুক্তিযোদ্ধাদের বন্দী করে রেখে তাঁদের ওপর অত্যাচার চালাত, সেই

কুখ্যাত সেলুলার জেলও তিনি পরিদর্শন করলেন। আন্দামানে নেতাজী এবং তাঁর সঙ্গীরা ছিলেন রস্ দ্বীপের ওপর পূর্বতন ইংরাজ চীফ্ কমিশনারের বাড়ীতে। সেখানে তখন জাতীয় তিরঙ্গা পতাকা সগর্বে উড়ছিল। নেতাজী আন্দামানের নতুন নামকরণ করলেন 'শহীদ' এবং নিকোবরের 'স্বরাজ' দ্বীপ।

১৯৪৪ এর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে নেতাজী ভারতীয় সীমান্তের দিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগতির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তাঁর হেড কোয়ার্টার্স সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করলেন। ১৯৪৪ এর ফেব্রুয়ারী মাসে এই ফৌজের প্রথম অগ্নি-পরীক্ষা হয়েছিল আরাকান রণক্ষেত্রে। আরাকানে চট্টগ্রাম যাবার পথে যে যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজ শত্রুদের চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়েছিল। এতে নেতাজী এবং আই. এন. এর সব শ্রেণীর সৈনিকরাই অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছিলেন এবং আমাদের সেনাবাহিনীর যোগ্যতা সম্বন্ধে জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ আশ্বস্ত হয়েছিলেন।

১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে ইম্ফলের ওপর প্রবল আক্রমণ সুরু করা হল। পূর্ব এশিয়ার এই শেষ আক্রমণাত্মক যুদ্ধে এম. জেড. কিয়ানির নেতৃত্বে প্রথম আই. এন. এ ডিভিশন এবং ব্রহ্মদেশে অবস্থিত জাপানী ডিভিশন অংশগ্রহণ করেছিল। জাপানীদের পক্ষে ত্রুটি ছিল ব্রহ্মদেশে তাঁদের ঘাঁটিগুলি রক্ষা করার জন্য একাধারে আক্রমণাত্মক এবং প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের দিক থেকে ত্রুটি ছিল ভারতবর্ষের গভীরে সশস্ত্র বিপ্লবাত্মক অভিযান, ভবিষ্যতে মুক্তিযুদ্ধের জন্য একটা শক্ত ঘাঁটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রবেশ পথ খুলে দেবার জন্য। ১৯৪৪ এর ২১শে মার্চ তাঁর অগ্রবর্তী হেড কোয়াটার্সে সাংবাদিক সম্মেলনে নেতাজী ঘোষণা করলেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে ১৮ই মার্চ ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে এবং ভারত-বর্ষের মাটিতেই যুদ্ধ চলছে। বিস্তীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রের তিনটি সেক্টরে

ভারত-জাপান সৈন্যবাহিনী দ্রুতগতিতে এগিয়ে গিয়েছিল। এপ্রিল এর প্রথম সপ্তাহে তারা উত্তরে কোহিমায় প্রবেশ করে। চমৎকার সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ ইম্ফলের দশ মাইলের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল। দুর্গম ও দুর্লজ্ঘ্য এলাকার মধ্যে দিয়ে মুক্তিফৌজ যখন লড়াই করতে করতে এগোচ্ছিল, নেতাজীর অবিস্মরণীয় বাণী ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের পাহাড় ও উপত্যকার মধ্যে দিয়ে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল ঃ

"দূরে, ঐ দূরে, ঐ নদীর ওপারে, ঐ অরণ্যের শেষে, ঐ পর্বতমালা ছাড়িয়ে আমাদের পুণ্যভূমি—যেখানে আমরা জন্মেছি এবং যে দেশে আমরা এখন ফিরে যাব····· রক্ত দিচ্ছে রক্তের ডাক, ওঠ, নষ্ট করার মত সময় আমাদের নেই। অস্ত্র তুলে নাও। ঐ তোমাদের সামনে পড়ে রয়েছে পথ—যে পথ তোমাদের পূর্বসূরীরা তৈরী করে গেছেন। ঐ পথ বেয়ে আমরা এগিয়ে যাব। শত্রুসেনাবাহিনী ভেদ করে আমরা এগিয়ে যাব, তবে যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, আমরা শহীদের মৃত্যু বরণ করব। আমাদের শেষ নিদ্রায় আমরা সেই পথ চুম্বন করব যে পথ দিয়ে আমাদের মুক্তি ফৌজ দিল্লী পৌঁছবে। দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ। চল দিল্লী !"

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে নেতাজী তাঁর ক্যাবিনেটের সদস্য এ. সি. চ্যাটার্জীকে মুক্ত অঞ্চলের গভর্ণর নিযুক্ত করলেন। অস্থায়ী সরকারের প্রশাসনিক শাখা আজাদ হিন্দ দল মুক্ত এলাকাগুলির শাসনের ভার নেবার জন্য ফৌজের সঙ্গে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিল। জাপানী প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছিলেন যে ভারতবর্ষের অধিকৃত অঞ্চলগুলি নেতাজীর অধীনে অস্থায়ী সরকারকে হস্তান্তরিত করা হবে।

কিন্তু দিল্লী অভিযান থমকে দাঁড়াল। অসময়ে ইতিমধ্যেই বর্ষা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ভারত-জাপান সেনাবাহিনীর বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষার ব্যবস্থা ছিল না এবং তাদের রসদ সরবরাহের পথ ছিল দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল। অপরপক্ষে আকাশপথ আমেরিকানদের বিমানবহরের

পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং ইম্‌ফল রক্ষায় শেষ প্রতিরোধের জন্য তারা প্রচুর সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র এনে ফেলল। ভারত-জাপান সৈন্য-বাহিনী যতদিন সম্ভব লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হল। চিন্দউইন এবং ইরাওয়াডি ধরে ফেরার সময় তাদের প্রচুর হতাহত হয়েছিল। ইঙ্গ-আমেরিকানরা যখন ব্রহ্মদেশ পুনর্দখলের জন্য তাদের প্রতি-আক্রমণ জোরদার করল, জাপানী এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ হঠে আসার সময় বীরত্বপূর্ণ প্রতি-রোধক যুদ্ধ করেছিল। যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর সঙ্গে নেতাজী ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন। অনেক সময় এমনও হয়েছিল যে তিনি নিজে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়বার বা যুদ্ধে নিহত হবার ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

১৯৪৪ এর ৬ই জুলাই রেঙ্গুন রেডিও থেকে নেতাজী মহাত্মাজীর উদ্দেশ্যে একটি বেতার বার্তা প্রচার করেছিলেন। সেই ভাষণে তিনি মুক্তি সংগ্রামের সমসাময়িক ইতিহাস এবং বিশেষ করে সেই ইতিহাসে গান্ধীজীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বর্ণনা করেছিলেন। তারপর তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের মতলব এবং নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ বুঝিয়ে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—'আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ইংরাজ সরকার ভারতের স্বাধীনতার দাবীকে স্বীকৃতি দেবে না।' নেতাজী আরও বলেছিলেন যে যুদ্ধে আমেরিকার লক্ষ্য হল বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করা এবং আমেরিকান শতাব্দীর সূচনা করা। সুতরাং, তিনি বলেছিলেন, "আমি নিশ্চিত যে আমরা যদি স্বাধীনতা চাই, রক্তের স্রোত বেয়ে আমাদের এগোতে হবে।" তারপর নেতাজী ১৯৪১ সালে ভারতবর্ষ থেকে তাঁর নিষ্ক্রমণের সময় থেকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি যে সব পদক্ষেপ নিয়েছেন তার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি মহাত্মাজীর উদ্দেশ্যে আরও বলেছিলেন—"যদি আমার আশা থাকত যে আমাদের জীবদ্দশায় আমরা আর একটি সুযোগ পাব, বর্তমান যুদ্ধের মত স্বাধীনতা অর্জনের

আর একটি সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া যাবে, তাহলে আমি সম্ভবত দেশত্যাগ করতাম না।" মহাত্মাজীকে তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—"আমি যা কিছু করেছি সবই আমার জাতির মঙ্গলের জন্য, বিশ্বের কাছে ভারতের মর্যাদা বাড়িয়ে তোলার জন্য এবং ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করার জন্য করেছি।"

গান্ধীজীর কাছে তাঁর বার্তার উপসংহারে তিনি বলেছিলেন—"ভারতবর্ষের স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধ সুরু হয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা ভারতের মাটিতে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করছে···এই সশস্ত্র সংগ্রাম ততদিন চলবে, যতদিন না শেষ ইংরাজ ভারতবর্ষ ত্যাগ করে এবং যতদিন না আমাদের জাতীয় তিরঙ্গা পতাকা দিল্লীর লাটপ্রাসাদে উত্তোলন করা যায়।"

"হে জাতির জনক! ভারতের মুক্তির এই ধর্মযুদ্ধে আমরা আপনার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি।"

১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে জাপানে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর পরামর্শের জন্য নেতাজীকে টোকিওতে আমন্ত্রণ জানান হয়। বিদেশের এক অতি সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে জাপান সরকার নেতাজীকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করার প্রস্তাব করে। ভারত স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোন সম্মান আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করবেন না —এই কারণ দেখিয়ে তিনি ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এই সময় নেতাজী টোকিওস্থ সেভিয়েট দূতকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু চিঠিটি না খুলেই ফেরত এসেছিল। এই সময়ে তিনি নিঃশর্ত ভারত-জাপান ঋণ চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন এবং কথা দিয়েছিলেন যে ঐ ঋণ পুরোপুরি শোধ করা হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বার্লিনে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারে যে ঋণ দেওয়া হয়েছিল, নেতাজী পূর্ব এশিয়া থেকে ঋণ শোধ বাবদ থোক টাকা জার্মান সরকারকে ফেরত দিয়েছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজকে নানাভাবে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য তিনি থাইল্যাণ্ড সরকারকে একটি বড় দানও দিয়েছিলেন।

১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসের শেষে নেতাজী যখন রেঙ্গুনে ফিরে গেলেন, ততদিনে সামরিক পরিস্থিতির আরও অনেক অবনতি হয়েছে। শত্রু-বিমান থেকে এক নাগাড়ে বোমাবর্ষণ চলছিল এবং স্থলযুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যবাহিনী সব ক্ষেত্রেই এগিয়ে যাচ্ছিল।

১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে নেতাজীর জন্মদিনে রেঙ্গুনের ভারতীয় সম্প্রদায় একটি বিরাট সমাবেশের ব্যবস্থা করে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রচুর পরিমাণে সোনা ও গয়নাগাঁটি দান করে নেতাজীর প্রতি তাঁদের বিশ্বাস ও আস্থা জানিয়েছিলেন। তার কিছুদিন পরেই নেতাজী যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যান। ইরাবতী যুদ্ধক্ষেত্রে কিয়ানীর পরিচালনাধীন আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম ডিভিসন খুব বিপদের মধ্যে পড়েছিল। নেতাজী নিজে সেনাবাহিনী ও যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করে দিনে কুড়িঘণ্টা কাজ করে যাচ্ছিলেন, যখন ক্লান্তির জন্য তাঁর সহকারীদের ক্ষেত্রে তিন তিনবার লোক বদলাতে হয়েছিল। নেতাজী যখন শুনলেন যে কয়েকজন আই. এন. এ. অফিসার ও সৈন্য পালিয়ে গেছে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে একটি হুকুমনামা জারী করে বলে দিয়েছিলেন যে যে-কোন পদমর্যাদারই হোক বিশ্বাসঘাতকদের গুলি করে শাস্তি দিতে হবে।

মিত্রশক্তির ফৌজদ্বারা রেঙ্গুন দখল যখন আসন্ন মনে হল, জাপানী কর্তৃপক্ষ নেতাজীকে তাঁদের সঙ্গে সহর ছেড়ে চলে যাবার জন্য অনুরোধ জানালেন। ঝাঁসীর রাণী বাহিনীকে যতক্ষণ পর্যন্ত সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নেতাজী ঐ অনুরোধ রক্ষা করতে পারবেন না বলে জানালেন। জাপানীরা তাঁর ইচ্ছামত ব্যবস্থা করতে বাধ্য হলেন। তারপর নেতাজী রাণীদের এবং তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে রেঙ্গুন থেকে বেরিয়ে ব্যাঙ্ককের দিকে রওনা হলেন। যাত্রাটি ছিল অত্যন্ত কষ্টকর, বৃষ্টিতে ও বন্যায় পথ প্রায় অনতিক্রম্য হয়েছিল এবং সমগ্র এলাকাটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ফৌজ থেকে বিচ্ছিন্ন সৈন্যের দল ও গেরিলারা। নেতাজীর দলের গাড়ীগুলি একের পর এক খারাপ হয়ে গেল। সেইজন্য তাঁকে সাহসী নারী সৈন্যদের এবং

তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে যেতে হল। রেঙ্গুন থেকে ব্যাঙ্কক পর্যন্ত এই ঐতিহাসিক পদযাত্রায় যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁরা অভাবনীয় প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁর অদম্য মনের বল, ধৈর্য এবং নেতৃত্বের অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখে গভীরভাবে অভিভূত হয়েছিলেন।

## ৩২

ঝাঁসীর রাণী বাহিনী এবং নেতাজীর সহকর্মীর পদযাত্রী দল রেঙ্গুন ছেড়ে যাবার এক মাস পরে ব্যাঙ্ককে গিয়ে পৌঁছেছিল। ব্রহ্মদেশে রেখে আসা ভারতীয় এবং সে দেশের বন্ধুদের প্রতি বিদায় বার্তায় নেতাজী বলেছিলেন—

"স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রথম রাউণ্ডে আমরা পরাজিত হয়েছি; কিন্তু আমরা প্রথম রাউণ্ডেই কেবল হেরেছি। আমাদের আরও অনেক রাউণ্ড লড়তে হবে…

"ভারতবর্ষের স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধের ইতিহাস যখন লেখা হবে, সেই ইতিহাসে ব্রহ্মদেশের ভারতীয়রা একটি মর্যাদার আসন পাবেন…

"ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য আমাকে ব্রহ্মদেশ ছেড়ে যেতে হচ্ছে। ভারতবর্ষ শীঘ্রই স্বাধীন হবে—এই স্থির বিশ্বাসে আমি অটল আছি।"

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি একই দিনে দেওয়া বাণীতে নেতাজী বলেছিলেন—"এই সঙ্কট মুহূর্তে তোমাদের প্রতি আমার একটিই নির্দেশ দেবার আছে এবং সেটি হল এই যে তোমাদের যদি সাময়িক-ভাবে হার মানতেই হয়, তাহলে তোমরা জাতীয় পতাকা উড্ডীন রেখে বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে শৃঙ্খলার সঙ্গে এবং আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে পরাজয় বরণ কর। ভারতের ভবিষ্যত প্রজন্ম যারা ক্রীতদাসরূপে জন্মগ্রহণ করবে না, তোমাদের বিরাট ত্যাগ স্বীকারের ফলে স্বাধীন মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করবে, তোমাদের নাম মহিমান্বিত

করবে এবং সগর্বে বিশ্বের কাছে ঘোষণা করবে যে তোমরা তাদের পূর্বসূরীরা মণিপুর, আসাম ও ব্রহ্মদেশে লড়েছিলে এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলে, কিন্তু সাময়িক ব্যর্থতা সত্বেও তোমরা অন্তিম সাফল্য এবং গৌরবের পথ সুগম করেছিলে।”

সিঙ্গাপুরে তাঁর পূর্বতন হেড কোয়ার্টার্সে ফিরে এসে নেতাজী তাঁর সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাসের কাজ, অসামরিক জনগণের আত্মবিশ্বাস আবার জাগিয়ে তোলা এবং মালয় উপদ্বীপে দীর্ঘ সংগ্রামের জন্য প্রশাসন এবং সশস্ত্র বাহিনীকে প্রস্তুত করার কাজে হাত দিলেন—এগুলি ছিল তাঁর যুদ্ধের পরিকল্পিত দ্বিতীয় রাউণ্ডের প্রস্তুতি। ইংরাজদের সঙ্গে কোন রকম আপোষ না করার জন্য—ওয়াভেলের প্রস্তাব এবং জিন্নার ভারত ভাগের দাবী না মানার জন্য আবেদন করে তিনি ভারতের জনগণের এবং ভারতীয় নেতাদের উদ্দেশ্যে ধারাবাহিকভাবে বেতার প্রচার করলেন। ভারতবর্ষকে ভাগ করার উদ্দেশ্যে কনফারেন্স টেবিলে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে এনে মিশিয়ে দেবার ইংরাজদের মতলব সম্বন্ধে তিনি ভারতীয় নেতাদের বিশেষ করে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

১৯৪৫ এর ৯ই আগষ্ট সোভিয়েট ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করল এবং রুশ সেনাবাহিনী সঙ্গে সঙ্গে মাঞ্চুরিয়া এবং উত্তরের জাপানী দ্বীপগুলি আক্রমণ করল। পরের সপ্তাহে আমেরিকানরা জাপানের দুটি সহর হিরোসিমা এবং নাগাসাকির ওপর আণবিক বোমা ফেলল। ফলে যুদ্ধের এবং মানব সমাজের ইতিহাসে অভূতপূর্ব ধ্বংস এবং জীবনহানি হল। জাপানের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল এবং ১৯৪৭ এর ১৪ই আগষ্ট জাপান মিত্রপক্ষের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করল।

জাপানের আত্মসমর্পণের খবর যখন নেতাজীকে জানান হল, তিনি তখন ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি অনুষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত দেখলেন,

তারপর হেড কোয়ার্টার্সে ফিরে গিয়েই তিনি মন্ত্রিসভার জরুরী সভা ডাকলেন। পরের দু'দিন তিনি সিঙ্গাপুরে এবং আশেপাশে সরকারের অসামরিক কর্মচারীদের এবং আই. এন. এ-র সৈনিকদের নিয়মমাফিক অব্যাহতি দেবার ব্যবস্থা করলেন। ১৯৪৫ এর ১৫ই আগষ্ট আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি একটি বিশেষ বাণীতে তিনি বললেন ঃ

"আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার সংগ্রামে এক অভাবনীয় সংকট আমাদের অভিভূত করেছে। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি তোমরা সত্যিকার বিপ্লবী সেনাবাহিনীর উপযুক্ত শৃঙ্খলা, মর্যাদা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে আচরণ করবে। ভারতবর্ষের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকবে এবং ভারতের নিয়তিতে তোমরা এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস হারিও না। দিল্লীর পথ অনেক এবং দিল্লী এখনও আমাদের লক্ষ্য। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে এবং অনতিবিলম্বে।"

ঐ একই দিনে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের প্রতি একটি বিশেষ বাণীতে তিনি বলেছিলেন—

"ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সবে শেষ হল ; সেই অধ্যায়ে পূর্ব এশিয়ায় ভারত সন্তানেরা অমর আসন লাভ করবে। আমাদের সাময়িক ব্যর্থতায় হতাশ হোয়ো না। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে ভারতবর্ষকে আর শৃঙ্খলিত করে রাখতে পারে!"

অনেকেরই বিশ্বাস ব্রহ্মদেশ পতনের পর থেকেই নেতাজী ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নে যাবার পরিকল্পনা করছিলেন। টোকিওর সর্বোচ্চ সামরিক কর্তৃপক্ষ এই পরিকল্পনাকে ভাল চোখে না দেখলেও দক্ষিণের জাপানী সেনাধিনায়ক তেরাউচি সহ কয়েকজন উচ্চপদস্থ জাপানী সামরিক অফিসার নেতাজীকে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রিসভার একটি সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে ১৯৪৪ এর ১৯ই আগষ্ট হবিবুর রহমান, এস. এ. আয়ার, আবিদ

হাসান, দেবনাথ দাশ এবং অন্য কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে নেতাজীর টোকিও যাত্রা করা উচিত। তাঁরা বিমানে টোকিও যাত্রা করেন এবং পথে তাঁরা ব্যাঙ্কক ও সাইগনে থেমেছিলেন। কয়েকজন জাপানী সামরিক অফিসারকে নিয়ে একটি ভারী জাপানী বোমারু প্লেন টোকিও যাচ্ছিল—সাইগনে নেতাজীকে সেই প্লেনে তুলে নেওয়া হল। ঐ প্লেনে আর একটি মাত্র জায়গা খালি ছিল বলে নেতাজী হবিবুর রহমানকে তাঁর সঙ্গে নিলেন। বাকিরা পরে আসবেন ঠিক হল। সাইগন ছেড়ে যাবার পর তাঁরা উত্তর ইন্দো-চীনে টুরেন নামে একটি জায়গায় এক রাত্রি কাটালেন। ১৮ই আগষ্ট তারিখে তাঁরা ঐ বিমানেই মাঞ্চুরিয়ার দাইরেন হয়ে টোকিও যাবার পথে তাইওয়ান গেলেন। টোকিও রেডিওতে ১৯৪৫-এর ২৩শে আগষ্ট ঘোষণা করা হল তাইহোকু বিমান বন্দর থেকে ওঠবার সময় ঐ প্লেনটি ভেঙ্গে পড়েছিল—তাতে জাপানী জেনারেল শীদেই, পাইলট এবং অন্যান্য কয়েকজন মারা গিয়েছিলেন এবং নেতাজী ব্যাপকভাবে পুড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। আরও বলা হয়েছিল যে ঐ রাত্রেই তাইহোকু সামরিক হাসপাতালে নেতাজী পরলোক-গমন করেন। হবিবুর রহমানের বক্তব্য অনুসারে নেতাজীর দেহা-বশেষ তাইহোকুতে দাহ করা হয় এবং সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ভস্মাবশেষ জাপানে নিয়ে গিয়ে টোকিওর সহরতলীতে রেণকোজি মন্দিরে রাখা হয়েছে। ভারতবর্ষে অনেকেই আজ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর সংবাদটি বিশ্বাসযোগ্য বলে মেনে নেন না।

ব্রহ্মদেশে যুদ্ধের সময় এবং বিশেষ করে রেঙ্গুনের পতনের পর আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের খবর কিছু কিছু ভারতে এসে পৌছচ্ছিল। যখন গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে আই. এন. এ বন্দীদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে এবং কারুর কারুর প্রাণদণ্ডও দেওয়া হয়েছে, জওহরলাল নেহরু একটি বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন 'তাদের শাস্তি দেওয়া হলে তা কার্যতঃ সারা ভারতের ওপর এবং সব ভারতীয়দের ওপর শাস্তি বলে গণ্য হবে।' সেপ্টেম্বর মাসে

শরৎচন্দ্র বসু মুক্তির অব্যবহিত পরেই স্পষ্ট ভাষায় ইংরাজ সরকারকে সাবধান করে দিয়েছিলেন—'আই. এন. এ অফিসারদের এবং সেনাদের মাথার একটি চুলও যেন স্পর্শ করা না হয়।' এই ধরণের ঘোষণা নেতাজী এবং আজাদ্ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে ভারতীয় জনগণের মানসিক প্রতিক্রিয়া নির্ণয় করেছিল।

১৯৪৫ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে তখন দারুণ ভাঁটা। আগষ্ট বিদ্রোহ এবং আজাদ হিন্দ বিপ্লবের পরাজয়ের পর জাতীয়তাবাদীরা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত ও হতাশাগ্রস্ত। ঐ ঘোর হতাশার মধ্যে ভারতের প্রেক্ষাপটে আজাদ হিন্দ ফৌজ যেন ঐশ্বরিক দান হিসাবে নেমে এল এবং এক ব্যক্তির বিশাল ছায়া ভারতীয় রাজনীতিকে পুরোপুরি অধিকার করল। সেই ব্যক্তি ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। আই. এন. এ বন্দীরা এবং পূর্ব এশিয়া থেকে প্রত্যাগত ভারতীয়রা নতুন করে এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। ইংরাজ শাসকশ্রেণী আই. এন. এ এবং নেতাজীর কীর্তিকলাপের উপর যে গোপনীয়তার জাল বিছিয়ে রেখেছিল তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং আজাদ হিন্দ আন্দোলনের বীরগাথা ও বৈচিত্রময় কাহিনী জাতিধর্ম বয়স, নারী-পুরুষ, রাজনৈতিক মতপার্থক্য নির্বিশেষে সমগ্র জাতিকে দেশপ্রেমের এক নতুন বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তিনজন আই. এন. এ অফিসার শাহ নওয়াজ, সায়গল এবং ধীলন এর বিচারে পক্ষ সমর্থনের জন্য একটি ডিফেন্স কমিটি গঠন করেছিল; এই কমিটির সুদক্ষ পরিচালনায় ছিলেন ভুলাভাই দেশাই। আই. এন. এর যোদ্ধারা রাতারাতি জাতীয় বীরে পরিণত হলেন। 'জয় হিন্দ' জাতীয় শ্লোগান হল। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান সেনাবাহিনীর মধ্যে গভীর উত্তেজনার সৃষ্টি হল এবং ফলে এয়ার ফোর্স এবং রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভীতে খোলাখুলি বিদ্রোহ হল। নেতাজী যেমন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন—১৯৪৬ সালের গোড়ায় যুদ্ধোত্তর বৈপ্লবিক জোয়ার জাতিকে স্বাধীনতার দোরগোড়ায় পৌঁছে দিল। ব্রিটিশ সম্রাটের

প্রতি ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর আনুগত্য নষ্ট করে তার বদলে ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রতি নতুন আনুগত্য সৃষ্টি করতে নেতাজী তাঁর মূল সংগ্রামী লক্ষ্যে দেশকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। উপরন্তু, ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ শুধু ভারতবর্ষকেই নয়, সমগ্র এশিয়াকে পরাধীন করে রাখার জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মিকে প্রধান অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত ; নেতাজী সেই পুরানো সামরিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে ভারতীয় ফৌজের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন।

## পরিশিষ্ট

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু স্বাতন্ত্র্যে এবং বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। শারীরিক এবং মানসিক গঠনে, আচার-আচরণে এবং জীবনধারায়, আদর্শে ও কাজে, শৌর্যে ও বীর্যে —এক কথায় তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বে এবং কীর্তিতে তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের এক অনন্য চরিত্র।

তাঁর জন্মের সময় বাঙ্গলার নবজাগরণের তরঙ্গ উত্তাল। সেই নতুন জাতীয়তার চেতনাবোধ তাঁর শৈশব ও কৈশোরের বিকাশে পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, এর প্রেরণা ও প্রতিক্রিয়া আত্মস্থ করে তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন। বাল্যকালেই ইংরাজী মিশনারী স্কুলের পরিবেশ তাঁর কাছে বিজাতীয় মনে হয়েছিল এবং তখনই মনে মনে তিনি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রমান্বয়ে এবং ধাপে ধাপে প্রথমে মানবদরদী, তারপর বিবেকানন্দের ধাঁচে সমাজ বিপ্লবী এবং শেষ পর্যন্ত কঠিন ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের পর একজন সক্রিয় রাজনীতিবিদ। সমসাময়িক ইতিহাসে এমন আর একজন খুঁজে পাওয়া শক্ত, যিনি জীবনের সুরু থেকেই জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অদম্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ। ১৯২১ সালে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ তাঁর ভবিষ্যত জীবনধারায় এমন এক গভীর ছাপ দিয়ে দিয়েছিল, যে কোন দিন আর পশ্চাদপসরণ বা আত্মসমপর্ণের প্রশ্ন ওঠেনি।

আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের আগেই, ১৯২০ সালে যখন তিনি কেম্ব্রিজে ছাত্র, তখনই নতুন ভারত গড়ে তোলায় কংগ্রেসের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর পরিষ্কার ধারণা ছিল। তাঁর বৈজ্ঞানিক মানসিকতায় ও চিন্তাধারায় যে পার্টি ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করবে, সেই পার্টিরই দায়িত্ব হবে দীর্ঘকালীন গবেষণা ও

পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্বাধীনতোত্তর জাতির পুনর্গঠন। তখনই তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গবেষক এবং বিশেষভাবে শিক্ষিত কর্মীদের কথা ভেবেছিলেন, যাঁরা স্বাধীন ভারতবর্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর ভূমিকা ছিল শেষ সংকটপূর্ণ পঁচিশ বছর। সুদূর অতীত থেকে সুরু করে ভারতীয় রাষ্ট্রের বিবর্তন সম্বন্ধে গভীর ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং বিশেষ করে ইংরাজদের ভারত বিজয় এবং শাসন সম্বন্ধে বাস্তব অনুশীলনের ওপর তিনি তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ গড়ে তুলেছিলেন। তিনি এই স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে ঔপনিবেশিক দাসত্বে নিষ্পেষিত ভারতবাসীদের এবং ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ মূলগতভাবে পরস্পরবিরোধী। সুতরাং এই দুই-এর মধ্যে কোনরকম সামঞ্জস্যবিধান বা আপোষ অসম্ভব। তাঁর এই চিন্তাধারা এবং বিশ্বাস ইংরাজ শাসনের প্রতি সম্পূর্ণ বিরোধিতার পথে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল এবং তিনি সবকিছু বুঝে এবং পরিকল্পিতভাবে দেশের মুক্তির জন্য আপোষহীন সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে তাঁদের জীবদ্দশাতেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে শেষ চূড়ান্ত সংঘর্ষ হবে এবং তাঁদের প্রজননের ভারতের জাতীয় বিপ্লবীদের ঐতিহাসিক কর্তব্য হবে শেষ সংগ্রামে ভারতের জয় সুনিশ্চিত করা। তিনি যেহেতু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে ভারতীয় জনগণের প্রধান মুখপাত্র বলে মেনেছিলেন, তাঁর অটল ও অক্লান্ত প্রচেষ্টা ছিল, প্রথমতঃ কংগ্রেসকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিরাট একটি ফ্রন্ট হিসাবে গড়ে তোলা, এবং দ্বিতীয়তঃ ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে আপোষ-বিরোধী সংগ্রামের পথে চালিত করা। ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে তাঁর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন, লাহোরে পাল্টা সরকার গঠনের জন্য এবং সর্বাত্মক বয়কটের ডাক, ১৯৩৮সালে হরিপুরায় ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠন ও স্বাধীন ভারতের মন্ত্রিসভা হিসাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের প্রস্তাব এবং সবশেষে

১৯৩৯ সালে ত্রিপুরীতে ইংরাজদের ভারত ত্যাগ করার জন্য চরমপত্র দেবার প্রস্তাব—এই সবগুলিই বুঝতে হবে আমাদের জাতীয় সংগ্রাম সম্বন্ধে তাঁর ভাবগত, আদর্শগত এবং কৌশলগত ধ্যানধারণার পরিপ্রেক্ষিতে।

১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের সভাপতি পদ গ্রহণের প্রাক্কালে সুভাষচন্দ্র তাঁর সামগ্রিক রাজনৈতিক চিন্তাধারা কয়েকটি কথায় প্রকাশ করেছিলেন : "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে এক ব্যাপক ও বিরাট সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্ট রূপে সংগঠিত করতে হবে এবং এর উদ্দেশ্য হবে দ্বিমুখী—রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা এবং একটি সমাজবাদী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা।" সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ইংরাজদের ভারতবর্ষকে শোষণ করার সর্বক্ষেত্রে সক্রিয় বিরোধিতা করার নীতিতে কংগ্রেস অনেক বছর ধরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। নেতাজী চেয়েছিলেন কংগ্রেস সেই নীতিতে অবিচলিত থাকুক এবং গণ সংগ্রামের তীব্রতা বাড়াক যাতে ইংরাজদের ভারতশাসন অচল করে দেওয়া যায়। গভীর নৈরাশ্যের সঙ্গে তিনি দেখলেন যে কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব সংগ্রাম করতে অনিচ্ছুক আর দলের বামশিবির দলাদলিতে বিভক্ত এবং অতিসূক্ষ্ম ও অসংখ্য তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে শক্তিহীন। ১৯৩৯ সালের পরও যখন সারা বিশ্বে আগুন জ্বলছে এবং সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ছে, তখনও এই পরিস্থিতি। ঐ বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় পূর্ণ আন্তর্জাতিক যুদ্ধ সংকটের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রামী বৈপ্লবিক পন্থায় আস্থা রেখে জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিলেন।

ভারতবর্ষে ইংরাজদের অবস্থানের শক্তি কোথায় এবং দুর্বলতা কোথায়, অন্যপক্ষে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের শক্তি কতটা ও দুর্বলতা কোথায়—এই দুই-এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে নেতাজী বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর সংগ্রামের কৌশল স্থির করেছিলেন। তিনি যদিও বিশ্বাস করতেন যে বিপ্লবের জন্য ভারতবর্ষ প্রস্তুত, জাতীয় নেতৃত্বের অন্যান্যরা ভাবতেন অন্যরকম। সুতরাং গণসত্যাগ্রহর দ্বারা ইংরাজ দুর্গকে দুর্বল করে বশ্যতা স্বীকার করানোর সম্ভাবনা ছিল

চিন্তার বাইরে। এই পরিস্থিতিতে একমাত্র যে শক্তি ভারতে ইংরাজ শাসন চালু রেখেছিল, অর্থাৎ ইংরাজের অনুগত ও বেতনভুক ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মি, নেতাজী সেটিকেই আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে ধরে নিলেন। আন্তর্জাতিক যুদ্ধ সংকটের মধ্যে নেতাজীর কর্তব্য হল ভারতীয় সৈনিকের সেই পুরানো আনুগত্যকে নষ্ট করে তার পরিবর্তে ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রতি নতুন আনুগত্য সৃষ্টি করা। যে কোন উপায়ে এবং যে কোন পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেবার জন্য একটি বিপ্লবী স্বেচ্ছাসেবী মুক্তি বাহিনী গঠন করে তিনি ইয়োরোপে এবং পূর্ব-এশিয়ায় ঠিক এই কর্তব্যই করেছিলেন। এক শতাব্দীর ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে —যে কোন অভ্যুত্থানের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণগত অভাব ছিল, সেটি হল সামরিক ঐতিহ্যের অভাব। নেতাজী যে নতুন সামরিক ঐতিহ্য এনে দিলেন তার ফলে কেবল যে ভারতের সেনাবাহিনীর সাম্রাজ্যবাদের প্রতি হীন বশ্যতার ঐতিহ্য নষ্ট হল তাই নয়, সমগ্র এশিয়াকে পরাধীন করে রাখার জন্য ইংরাজদের হাতে যে শক্তিশালী অস্ত্রটি ছিল, সেটি ধ্বংস হয়ে গেল।

চার দশক আগে নেতাজী রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে অন্তর্হিত হন; তার পর থেকে বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং জাতীয় পরিস্থিতিরও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। এশিয়ার অধিকাংশ দেশে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ পরাজিত হয়েছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নতুন আকারে দেখা দিয়েছে। চিরকালের মত আজও মানব স্বাধীনতা নানা দিক দিয়ে বিপন্ন। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের অমর প্রতীক হিসাবে নেতাজী সমগ্র অত্যাচারিত মানব সমাজের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ হয়ে রয়েছেন। ভারতবর্ষের জন্য তিনি বিশ্বাস ও অনাগত দিনের প্রতিশ্রুতির উৎস—এই মহান দেশের ঐতিহাসিক নিয়তিকে মেনে নিয়ে গত দু'শতাব্দী ধরে সারা বিশ্বে যত সামাজিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে সেগুলির সমন্বয়ের ওপর ভিত্তি করে সামাজিক ও রাজনীতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি নতুন সমাজ ব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠার দুর্জয় সঙ্কল্প।

একজন মানুষ এবং চিন্তাবিদ হিসাবেও নেতাজী একটি নতুন দর্শনের সন্ধান করছিলেন—মানব সমাজের জন্য এক নতুন নীতিবোধ। সমসাময়িক বিশ্ব ইতিহাসে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তিনি একই সঙ্গে ভারতের মহান আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে গভীরভাবে প্রভাবিত, অন্যদিকে বিশ্বের যে কোন দেশের অতি-আধুনিক সামাজিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতিতে সক্রিয়ভাবে অংশীদার। তিনি দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর অনন্যচিত্ত উৎসর্গ, অবাধ্য সাহস, বেপরোয়া আত্মত্যাগ এবং আদর্শের জন্য অন্তহীন আত্ম-সমর্পণ দিয়ে। এই সাধনায় তিনি যথেষ্ট সাফল্যও অর্জন করেছিলেন এবং তিনি নেতৃত্বের এক নজির হয়ে আছেন। যদিও তিনি তাঁর সময়ের অনেক আগেই চলে গেছেন, চিন্তায় এবং কাজে তাঁর উত্তরাধিকার বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য জীবন্ত হয়ে রয়েছে। কে জানে, ভারতবর্ষ হয়ত যথাসময়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে আবার চিনে নেবে ও গ্রহণ করবে এবং তাঁর নিজের কথায়—"ভারতের যে চিরন্তন বাণী আছে তা জগৎ সভায় পৌঁছে দেবে।"

## নেতাজী
### অতিরিক্ত পাঠ্য

সুভাষচন্দ্র বসু : সমগ্র রচনাবলী—১ম খণ্ড : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
ঐ —২য় খণ্ড : ঐ
সুভাষচন্দ্র বসু : তরুণের স্বপ্ন— ঐ
শিশিরকুমার বসু : মহানিষ্ক্রমণ— ঐ
কৃষ্ণা বসু : ইতিহাসের সন্ধানে— ঐ
কৃষ্ণা বসু : চরণ রেখা তব— ঐ
শিশিরকুমার বসু : বসুবাড়ি— ঐ

Netaji : Collected Works Vol. 1 : The Indian Pilgrim and Letters 1897-1921, Netaji Research Bureau, Calcutta, 1980.

Netaji : Collected Works Vol. 2 : The Indian Struggle 1920-1942. Netaji Research Bureau, Calcutta, 1981.

Netaji : Collected Works Vol. 3 : Correspondence 1920-1926, Netaji Research Bureau, Calcutta, 1982.

Netaji : Collected Works Vol. 4 : Correspondence 1926-1932, Netaji Research Bureau, Calcutta, 1982.

Netaji : Collected Works Vol. 5 : Correspondence, Speeches and Writings. 1926-1929, Netaji Research Bureau, Calcutta, 1982.

Crossroads : Collected Works of Subhas Chandra Bose

1938-1940. 2nd Ed., Netaji Research Bureau, Calcutta, 1981.

Netaji and India's Freedom : Proceedings of the First International Netaji Seminar 1973, Ed. Sisir K. Bose, Netaji Research Bureau, Calcutta, 1975.

Netaji : A Pictorial Biography, Ed. Sisir K. Bose & Birendra Nath Sinha, Ananda Publishers (P) Ltd., Calcutta, 1979.

Fundamental Questions of Indian Revolution : Subhas Chandra Bose, Netaji Research Bureau, Calcutta, 1970.

The Great Escape : Sisir Kr. Bose, Netaji Research Bureau, Calcutta, 1st Ed., 1975.

A Beacon Across Asia : A biography of Subhas Chandra Bose, Ed. Sisir K. Bose, A. Werth & S. A. Ayer, Orient Longman, New Delhi, 1973.

I warned my Countrymen : Collected Works of Sarat Chandra Bose, 1945-1950, Netaji Research Bureau, Calcutta, 1968.

The Voice of Sarat Chandra Bose : Selected Speeches 1926-1941, Netaji Research Bureau, Calcutta, 1979.

The Oracle : A Quarterly Review of History, Current Affairs and International Relations, Netaji Research Bureau, Calcutta, Vols. 1 to 8.

---